সপ্তম অধ্যায়

উনিশ শতকের কথাসাহিত্যে (উপন্যাস ও ছোটগল্প) স্বদেশ ভাবনা

কথাসাহিত্য বলতে উপন্যাস ও ছোটগল্পকে বোঝায়। উনিশ শতকেই প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯), তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রমুখ বাংলা কথাসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়েছেন। উনিশ শতকের উপন্যাস ও ছোটগল্প বাঙালীর আত্মচেতনার বিকাশে কতখানি ভূমিকা পালন করেছিল, এই অধ্যায়ে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

ধারাবাহিকতার বিচারে প্রথমে উপন্যাসের কথা আসবে। উপন্যাস প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে লিখেছেন;—

> "ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের দেশে যে সব নূতন ধরনের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে উপন্যাসই প্রধানতম। এই উপন্যাসের অনুরূপ কোন বস্তু আমাদের পুরাতন সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"(১)

অর্থাৎ উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের অস্তিত্ব ছিল না। এই শতকেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রজনী' (১৮৭৭), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'রাজসিংহ' (১৮৮২), 'আনন্দমঠ' (১৮৮৪), 'দেবীচৌধুরাণী' (১৮৮৪), 'রাধারাণী' (১৮৮৬) ও 'সীতারাম' (১৮৮৭), রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪), 'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৭), 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' (১৮৭৮), 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' (১৮৮৯), 'সংসার কথা' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৪), তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪), প্রভৃতি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল। তাছাড়া সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৩৪—১৮৮৯) 'জালপ্রতাপ চাঁদ' (১৮৮৩), 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' (১৮৭৭), 'কণ্ঠমালা' (১৮৭৭), 'মাধবীলতা'(১৮৮৫), প্রতাপচন্দ্র ঘোষের (?—১৯২১) 'বঙ্গাধীপ পরাজয়' (১৮৬৯—১৮৮৪), শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৮—১৯১৯) 'মেজবৌ' (১৮৭৯), 'নয়নতারা' (১৮৮৯); 'যুগান্তর' (১৮৯ ৫), স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-

-১৯৩২) 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬), 'মালতী' (১৮৮০), 'স্নেহলতা' (১৮৯২), 'কাহাকে' (১৮৯৮), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৯—১৯১১) 'কল্পতরু' (১৮৭৪), যোগেশচন্দ্র বসুর (১৮৫৪—১৯০৫) 'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬-১৮৮৮), চিনিবাসচরিতামৃত (১৮৮৬) কালাচাঁদ (১৮৮৯-১৯৯০), ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৫৭-১৯১৯) 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২), ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বউঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩), 'রাজর্ষি' (১৮৮৭), উনিশ শতকের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

উল্লিখিত উপন্যাসগুলির কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে কখনো ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে আবার কখনো সমাজ থেকে। কখনো বা উপন্যাসে স্থান পেয়েছে রঙ্গব্যঙ্গ। কাহিনীর রসের ক্ষেত্রে এরকম বৈচিত্র্য থাকলেও উপন্যাসের আবেদনের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য পাওয়া যাবে। এই সময়ের লেখক উপন্যাসের শিল্পরূপ সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করতেন এবং দেশ ও সমাজের মঙ্গলের জন্য নীতি-উপদেশও দিয়েছেন। অর্থাৎ উপন্যাস লেখার পিছনে ছিল লেখকের মহৎ উদ্দেশ্য। আমরা লেখকের উপন্যাস লেখার পিছনে বাঙালীর আত্মচেতনাবিকাশের একটি ভূমিকা লক্ষ করব। এই অধ্যায়ে উপন্যাসের আলোচনাকে তিনটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমতঃ বাংলা উপন্যাসকে সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ প্রকরণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা দানের ইতিকথা, দ্বিতীয়তঃ সমাজে সুস্থভাবে বাঁচার জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ও তৃতীয়তঃ জাতীয়তাবোধের প্রচার ।

প্রথমে সাহিত্য প্রকরণ হিসাবে বাংলা উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা লাভের পরিচয় নেওয়া যাক। উনিশ শতকে উপন্যাস নামক সাহিত্য প্রকরণটি সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালীর অসম্ভব আগ্রহ ছিল। এই সময় অনেক শিক্ষিত বাঙালীকে মাতৃভাষায় উপন্যাস রচনার নেশা পেয়ে বসে। উনিশ শতকে অনেক লেখকের এই নেশা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এবিষয়ে প্রথমেই প্যারীচাঁদ মিত্রের কথা বলতে হবে। তিনি বাংলায় উপন্যাস লিখে বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র্য আনতে চেয়েছিলেন। এবিষয়ে তাঁর স্বীকৃতি উল্লেখ করা হল । তিনি 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ বলেন;—"The above original Novel in Bengali being the first work of the kind, is now submitted to the public with considerable diffidence"[২] কিংবা 'ভূমিকা'য় বলেন;—

> "অন্যান্য পুস্তকাদি অপেক্ষা উপন্যাসাদি পাঠ করিতে প্রায় সকল লোকেরই মনে স্বভাবতঃ অনুরাগ জন্মিয়া থাকে এবং যে স্থলে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক কোন পুস্তক পাঠ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতে রত নহে সে স্থলে উক্ত প্রকার গ্রন্থের অধিক আবশ্যক, এতদ্বিবেচনায় এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি রচিত হইল।...এ প্রকার পুস্তক লেখনের প্রণালী এতদ্দেশ মধ্যে বড় প্রচলিত নাই, ইহাতে প্রথমোদ্যমে অবশ্য সদোষ হইবার সম্ভাবনা, পাঠকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া ঐ দোষ ক্ষমা করিবেন।"[৩]

'PREFACE' ও 'ভূমিকা' থেকে জানা যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল'-কে বাংলার 'প্রথম উপন্যাস' বলতে চেয়েছেন। এই 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখে বাংলা সাহিত্যের প্রকরণগত বৈচিত্র্য এনে প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙালীর রসপিপাসাকে তৃপ্তি দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। তাঁর এই লেখা বাংলা উপন্যাস উদ্ভবের ক্ষেত্রে বা উপন্যাসের প্রথম শিল্পরূপ নির্মাণের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল। এবিষয়ে হরিনাথ মজুমদার নামক একজন লেখকের কথা স্মরণ করব। তিনি লিখেছিলেন 'বিজয় বসন্ত' (১৮৫৯)। এতে তিনি কতখানি সফল হয়েছিলেন, তা এখানে বিচার্য নয়। বাংলা উপন্যাস উদ্ভবের প্রথম দিকে উপন্যাসকে শিল্প সম্মত করার উদ্যোগের বিশেষ তথ্যটি আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান। 'বিজয় বসন্ত'র ভূমিকায় হরিনাথ মজুমদার বলেছিলেন;—

> "বালকেরা ব্যাকরণ, পদার্থবিদ্যা, ভূগোলাদি সর্ব্বদা অধ্যয়ন করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হয়। এজন্য Novel অর্থাৎ রূপক ইতিহাস পড়িতে ইচ্ছুক হইয়া থাকে। এক্ষণে কামিনীকুমার, রসিকরঞ্জন, চাহারদরবেশ, বাহারদানেশ প্রভৃতি যে সমুদায় রূপক ইতিহাস প্রচারিত আছে, সে সমুদায়ই অশ্লীল ভাব ও রসে পরিপূর্ণ। তৎপাঠে উপকার না হইয়া বরং সর্ব্বতোভাবে অনর্থের উৎপত্তি হয়। এই সমুদায় অবলোকনে বালকদিগের রূপক পাঠের নিমিত্ত কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে আমি বিজয় বসন্ত নামক এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই।"(৪)

হরিনাথ মজুমদার 'বিজয় বসন্ত'-এ নতুন রসের অবতরণা করতে চেয়েছেন। এবং তাঁর রচনাকে তিনি উপন্যাস হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাতে হয়ত তিনি ব্যর্থই হয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিম -পূর্বে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে হরিনাথ মজুমদারের একটি উদ্যোগ ছিল। এই বিশেষ সংবাদটি আমাদের নিকট তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্কিম -পূর্বে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের একটি সফল উদ্যোগ আছে। বিখ্যাত সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন;—"ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাব ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) দ্বারা নিশ্চিতভাবে সূচিত হইয়াছে।"(৫) বাংলা উপন্যাসের প্রথম দিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছেন। তিনি 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' এর ভূমিকায় লেখেন;—

> "গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়, ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ইহাতে দুইটি স্বতন্ত্র উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহার প্রথমটির সহিত দ্বিতীয়টির কোন সম্বন্ধ নাই। উভয় উপন্যাসেই রাজ্যসম্বন্ধীয় যে সকল কথা আছে, তাহা প্রকৃত ইতিহাসমূলক। অপরাপর যে সকল বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহারও কোন কোন অংশ মাত্র ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়,...।"(৬)

এই সব তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বঙ্কিম পূর্বে বাংলা উপন্যাস রচনার একটি উদ্যোগ ছিল।

এবার আমরা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের সংবাদটির সন্ধান করব। রাজা রামমোহনের পরলোকগমনের (১৮৩৩) প্রায় পাঁচ বছর পর বঙ্কিমের জন্ম (১৮৩৮)। এই সময় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও স্বদেশীয় ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে স্বদেশগঠনে যুগচিন্তা নায়কগণ পাথেয় করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই যুগ পরিবেশে মানুষ হন। তিনি আধুনিক শিক্ষা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য প্রেমে ক্রমশ আকৃষ্ট হন। হুগলী কলেজে পড়ার সময় কবিতা চর্চায় হাত পাকিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে ইংরেজীতে 'Rajmohan's Wife' (১৮৬৪) নামে একটি উপন্যাস লেখেন। ইতিপূর্বে B.A. (১৮৫৮) ডিগ্রি লাভের বিরল সম্মান পেয়েছেন। ঠিক এই সময় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য কলম ধরেন। বঙ্কিমচন্দ্রও বিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের প্রভাবে বাংলায় উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা করেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) ও 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) উপন্যাস দুটি রচনা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সফল ঔপন্যাসিক হিসাবে অত্মপ্রকাশ করেন। জীবনের এই বিশেষ সময়টিতে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠককে ভাল লেখা উপহার দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। যোগেশচন্দ্র বাগল বলেন; —

> " 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা সাহিত্যে ভাষা ও ভাবের নবযুগ প্রবর্তন করিয়াছিল। কিন্তু প্রকাশের পূর্বে এখানির উৎকর্ষাপকর্ষ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে তেমন স্থিরনিশ্চয় হইতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সাধারণতএই রীতি ছিল যে, তাঁহার কোনও পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্বে কাহাকেও পড়িয়া শুনাইতেন না, অথবা সহোদর ভিন্ন কাহাকেও পাণ্ডুলিপি স্পর্শ করিতে পর্যন্ত দিতেন না। কিন্তু এই প্রথম উপন্যাসখানি সম্বন্ধে তাঁহার এ রীতির ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইবার পূর্বে কাঁটালপাড়ার বাটীতে অনেককে ইহা পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।"(৭)

যোগেশচন্দ্র বাগল পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যের উল্লেখ করে লিখেছেন —

> "বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম হইতে ধারণা ছিল যে, 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা ব্যাকরণ-দোষে দূষিত। সেজন্য তিনি গল্প পাঠ শেষ হইলে উপস্থিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাষার ব্যাকরণ দোষ আছে—উহা কি লক্ষ্য করিয়াছেন?" (৮)

এই প্রসঙ্গে শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম-জীবনী' গ্রন্থে 'উপন্যাস পরিচয়' নামক অংশে 'দুর্গেশনন্দিনী'র আলোচনায় বলা হয়েছে;—

> "অনেকেই অবগত আছেন, দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। যখন তাঁহার বয়স চব্বিশ বৎসর, তখন তিনি এই গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। বোধহয় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ লেখা শেষ হয়।

তখন তিনি খুলনায়। রচনা শেষ করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন না, উপন্যাসখানি প্রকাশের যোগ্য হইয়াছে কিনা। তিনি পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে আদ্যন্ত শুনাইয়াছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় পুস্তকখানি প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিমর্ষ ও কাতর হইয়া পড়িলেন। তখনও তাঁহার আত্মনির্ভরতা জন্মায় নাই—তখনও তিনি তাঁহার সত্য বুঝিতে পারেন নাই। ...অবশেষে ভ্রাতৃদ্বয়ের ভুল ভাঙ্গিল। সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ম্মস্থলের অভিমুখে ধাবিত হইলেন; এবং দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া দ্বিতীয়বার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ফল এই দাঁড়াইল, সঞ্জীবচন্দ্র, দুর্গেনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া কাঁটাল পাড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং মুদ্রাযন্ত্রের শরণ লইয়া অচিরে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশ করিলেন।"[৯]

এসব যুক্তি ও তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনার প্রথম দিকে সদা সতর্ক ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে তিনি পাঠকের প্রতি নীতি উপদেশ বা বিতর্কিত কোন বিষয়কে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলেছিলেন। কেননা, ভাল লিখে স্বীকৃতি আদায় তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। এই কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়াই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। তিনি জানতেন "লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।"[১০] দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) রচনা করার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের নজর ছিল লেখাটিকে বিতর্কহীন করে তোলার দিকে। কেননা, তখনও তিনি প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক হন নি। সেজন্য 'কপালকুণ্ডলা'র পরিকল্পনা ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের পরামর্শ চেয়েছিলেন। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ'-এ জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন;—

"যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজসংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে, এবং তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে ?"[১১]

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেন — কিছু দিন সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকলেও পরে সন্তান সন্ততি হলে মেয়েটির মন থেকে কাপালিকের প্রভাব মুছে যাবে। আমাদের বক্তব্য বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের দ্বিতীয় বাংলা উপন্যাস লিখতে গিয়ে লেখাটিকে ভাল করার জন্য বারবার ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঠিক এমন সময় দীনবন্ধুর মতো বাংলার বিখ্যাত নাট্যকারের সান্নিধ্য পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমস্যা উপস্থাপন করেন। এতে তাঁর উপন্যাস লিখতে গিয়ে অতি সতর্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম দিকে বাংলা উপন্যাস রচনা করতে তাঁর অতি সতর্ক পদসঞ্চার

তাঁকে সাহিত্য- গুণসমৃদ্ধ উপন্যাস রচনায় সাফল্য এনে দিয়েছিল। 'কপালকুণ্ডলা' প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন;—"এখানে বঙ্কিমের প্রতিভা নিজ স্বরূপের পরিচয় পাইয়াছে, এবং সমস্ত অনুকরণ ত্যাগ করিয়া নিজের জন্য একটি সম্পূর্ণ নূতন পথ বাহির করিয়া লইয়াছে।"(১২)

'কপালকুণ্ডলা'র সাফল্যের পর বঙ্কিমচন্দ্র আর থেমে থাকেন নি। উপন্যাসের পাতায় ক্রমশ তাঁর ব্যক্তিক অনুভূতি, ভাললাগা, মন্দলাগা প্রকাশ করেন। সমাজ বা দেশের মঙ্গলের জন্য বিতর্কিত এমন বিষয়কেও ক্রমশ তিনি উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। কেননা, ততদিনে তিনি প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক। বাঙালী পাঠক তাঁর লেখাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। 'কপালকুণ্ডলা'র ঠিক পরের দুটি উপন্যাস 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) ও 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) থেকে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। 'মৃণালিনী'তে প্রচলিত বাঙালীর কাপুরুষতার কলঙ্ককে বঙ্কিম মেনে নেন নি। মিনহাজউদ্দীনের লেখা ১৭ জন অশ্বারোহির দ্বারা লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ের ইতিহাস—তাঁর সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। এবিষয়ে তিনি উপন্যাসে স্পষ্ট করে বলেন;—

> "ষোড়শ সহচর লইয়া মর্কটাকার বখ্‌তিয়ার খিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল।
>
> ষষ্টি বৎসর পরে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিন্‌হাজ্‌উদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্ত্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই।"(১৩)

এই জাতীয় ভালোলাগা মন্দলাগার বক্তব্য প্রথম দু'টি উপন্যাসে নেই।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা বিবাহের মতো একটি বিতর্কিত বিষয়কে স্থান দিয়েছেন। বিধবা কুন্দনন্দিনীর বিয়েতে লেখকের সমর্থন ছিল না। তিনি মনে করেন এ বিয়ে বৃহত্তর আদর্শে নয়, নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর অসংযমতাই উপন্যাসের বিধবা বিবাহকে ত্বরান্বিত করেছে। কুন্দনন্দিনী একান্তে ভেবেছে;—"কেহ নাই—মনের সাধে নাম করি। ন-নগ-নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, নগেন্দ্র... আচ্ছা-সূর্য্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি আমার সঙ্গে হতো—দূর হউক ডুবেই মরি।"(১৪) নগেন্দ্র কুন্দকে বলেছে;— "আর পারি না। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। শুন, কুন্দ! এখন বিধবা বিবাহ চলিত হইতেছে — আমি তোমাকে বিবাহ করিব।"(১৫) এখানে নগেন্দ্র-বিধবা কুন্দের পারস্পরিক রূপমোহের আকাঙ্ক্ষা বিবাহকে বাস্তবায়িত করেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীর মানবিক মর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য বিধবা বিবাহের পক্ষে মত দেন। বিদ্যাসাগরের এই মহৎ ও পবিত্র উদ্যোগকে সেসময় প্রগতিশীল গোষ্ঠী সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটি বিধবার বিয়েকে সমর্থন করে রচিত হয় নি। 'সাম্য' নামক প্রবন্ধে তিনি বলেন;—

"কেহ যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, স্ত্রীশিক্ষা ভাল কি মন্দ? সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত কি না, আমরা তখনই উত্তর দিব, স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর; সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া উচিত; কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমাদিগকে কেহ সেরূপ প্রশ্ন করিলে আমরা সেরূপ উত্তর দিব না।"(১৬)

বঙ্কিমচন্দ্র বিধবার বিয়েকে নির্বিচারে সমর্থন করেন নি। আর তাই বিদ্যাসাগরের মত মহৎ পণ্ডিত ব্যক্তির বিধবা বিবাহের ব্যাপক আন্দোলনের পরেও বঙ্কিম বলেছিলেন;—

"সকল বিধবার বিবাহ কদাচ ভাল নহে....এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে "যদি" পুরুষ পুনর্ব্বিবাহে অধিকারী হয়, তবেই স্ত্রী অধিকারিণী, কিন্তু পুরুষেরই কি স্ত্রীবিয়োগান্তে দ্বিতীয় বার বিবাহ উচিত ? উচিত, অনুচিত স্বতন্ত্র কথা; ইহাতে ঔচিত্যানৌচিত্য কিছুই নাই। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে, যে যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই, এমত কার্য্যমাত্রই প্রবৃত্তি অনুসারে করিতে পারে।"(১৭)

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন — পুরুষ কিংবা নারীকে যদি দ্বিতীয় বিবাহ করতেই হয়, তাহলে লক্ষ রাখতে হবে সে বিয়ে যেন অন্য কারো অন্যায়ের কারণ না হয়। অথচ 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে, সমকালের আইনের বলে ক্ষমতাবান ব্যক্তি নগেন্দ্রের রূপমোহ বা সম্ভোগ তৃষ্ণা চরিতার্থ করার দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের দ্বারা বলতে চেয়েছেন, প্রগতিশীল গোষ্ঠীর নির্বিচারে বিধবা বিবাহের সমর্থন নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর মতো অনেক সুখী সমৃদ্ধ সংসার নষ্ট করে দিচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র যেন সূর্য্যমুখীর মুখ দিয়ে বিধবা বিবাহের আন্দোলনকে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করেন। সূর্য্যমুখী বলেছে—'ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মুর্খ কে ?"(১৮)

আমরা লক্ষ করলাম, 'মৃণালিনী' বা 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিতর্কিত বিষয়কে স্থান দিয়েছেন। অথচ লেখক, ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে কোনরকম সমালোচনা বা বিতর্কিত বা প্রত্যক্ষ নীতি-উপদেশের মতো বিষয়কে সহজেই এড়িয়ে যান। আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেমিকের প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা পরিচয় প্রথম উপন্যাস দু'টিতে নেই বললেই চলে। তিনি ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের পরেই বিতর্কিত বিষয়, দেশপ্রেম বা সমাজকল্যাণের মতো বিষয়কে উপন্যাসের সঙ্গে অভেদ করে তুলেছেন।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৪৩-১৮৯১) সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'। উপন্যাসের অনেকাংশ রাজসাহীর শ্রীকৃষ্ণদাস সম্পাদিত 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রে প্রথম বর্ষের ১২৭৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন থেকে ১২৮০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'স্বর্ণলতা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইতিমধ্যে

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় একাধিক উপন্যাস লিখে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঔপন্যাসিক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রোমান্সের অতিরঞ্জন চোখে পড়ার মতো। প্রসঙ্গত ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন;—

> "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি স্থূলতঃ দুইভাগে বিভক্ত—এক শ্রেণী সম্পূর্ণ বাস্তব, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বর্ণনা ও ব্যাখ্যাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় শ্রেণী ঐতিহাসিক বা অসাধারণ ঘটনাবলীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ উপন্যাসে 'novel ও 'romance' বলিয়া যে দুইটি প্রধান বিভাগ আছে, বঙ্কিমের উপন্যাসেও সেই দুইটি বিভাগ বর্তমান।"(১৯)

রোমান্স ও সামাজিক উপন্যাসের তুলনা প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন;—

> "তবে সামাজিক উপন্যাসের সঙ্গে ইহার একমাত্র প্রভেদ যে, বাস্তবতার বন্ধন ইহাকে একেবারে নাগপাশের মত সুদৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরে নাই, ইহার মধ্যে বিচিত্র ও অসাধারণ ব্যাপারের অপেক্ষাকৃত অধিক অবসর আছে। সাধারণ উপন্যাসের ন্যায় রোমান্সের ক্ষেত্রে বাস্তবতার দাবি এত প্রবল বা সর্বগ্রাসী নহে।"(২০)

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আপত্তি — বাস্তব সম্মত সামাজিক উপন্যাসের পরিবর্তে বাংলা সাহিত্যে রোমান্স মূলক উপন্যাসের বাহুল্যে। কেননা, সে সময়ে বাংলা সাহিত্যের প্রধান ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সমূলক উপন্যাসই লিখছিলেন। 'স্বর্ণলতা'র পূর্বে বাঙালী পাঠক উপন্যাসের রোমান্স রসে বিভোর ছিলেন। যদিও 'স্বর্ণলতা'র সমসাময়িক বঙ্কিমচন্দ্রেরই দু'টি সামাজিক উপন্যাস রচিত হয়েছিল। তবুও 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) ও 'ইন্দিরা' (১৮৭৩) রোমান্সহীন নয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন;—

> "বঙ্কিম সামাজিক উপন্যাসেরও রোমান্সের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই—তাঁহার সামাজিক উপন্যাসগুলিও অনেকটা রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত। 'রজনী'তে এই অতি প্রাকৃত ও অসাধারণের স্পর্শ খুব সুস্পষ্ট;—'বিষবৃক্ষ'- এও একটা সাংকেতিকতার আভাস বর্তমান; 'ইন্দিরা' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই প্রভাব হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক মুক্তিলাভ করিয়াছে।"(২১)

এই সূত্রে বলা যায়—'স্বর্ণলতা'র পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলি যথাক্রমে 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) রোমান্সধর্মী উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসের এই একমুখী পথচলা রোধ করতে বা পাঠককে প্রকৃত বাস্তব সামাজিক রসের আস্বাদন দিতে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কলম ধরেন। প্রথম উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'য় তিনি এবিষয়ে আশাতীত সাফল্য পান। সমসাময়িক কালের আর এক

বিখ্যাত লেখক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্বর্ণলতা' বিষয়ে লেখক তারকনাথকে একটি পত্রে লেখেন;—

> "নামের ভার নাই, বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নাই, তবু তোমার "স্বর্ণলতা" চতুর্থবার মুদ্রিত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় এখনকার অবস্থায় ইহা সামান্য শ্লাঘার কথা নয়। তাহার উপর ইংরেজী ধরনের প্রণয়-লীলা, চোর-ডাকাইতের অদ্ভুত খেলা, আকস্মিক বিচ্ছেদ, অভাবনীয় মিলন—এসকল প্রসঙ্গের ছায়াপাত বর্জ্জিত হইয়াও যে গ্রন্থ এত আদরের সামগ্রী, তাহার অসাধারণ কোন গুণ আছে, ইহা কে না স্বীকার করিবে?"(২২)

—এখানে উপন্যাস হিসাবে 'স্বর্ণলতা'র শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। উপন্যাসটির সম্পাদনা করতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্তদাস বলেছেন;—" 'স্বর্ণলতা'র প্রথম কয়েকটি সংস্করণে গ্রন্থকার স্বীয় নাম প্রকাশ করেন নাই।"(২৩) আমাদের মনে হয়, গ্রন্থকার তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মনে একটা আশঙ্কা ছিল, বাঙালী পাঠক তাঁর ব্যতিক্রমী উপন্যাসটি আদৌ গ্রহণ করবে কি না। সেজন্যই তিনি তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত গ্রন্থকার হিসাবে নিজের নাম গোপন রাখেন। অবশ্য উপন্যাসটির জনপ্রিয়তার শীর্ষলগ্নে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুরোধে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েরই লিখিত একটি পরিচিতি পত্রের দ্বারা তিনি ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করেন।

ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের রোমান্স বিমুখ মনোভাবের তথ্যটি 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। লেখক বলেন;—

> "গ্রন্থকারেরা লোকের মনের কথা টের পান এবং ইচ্ছা হইলে সকল স্থানেই গমনাগমন করিতে পারেন। নহিলে সুন্দর বকুলতলায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, ভারতচন্দ্র রায় তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন; এবং মাইকেলই বা কি প্রকারে পরলোকের বৃত্তান্ত অবগত হইলেন? এবং তদপেক্ষাও দুর্গম যে মুসলমানের অন্তঃপুর, বঙ্কিম বাবু কি প্রকারে তথায় উপস্থিত হইয়া ওসমান ও আয়েসার কথোপকথন শুনিতে পাইলেন? এ ভিন্ন গ্রন্থকারদিগের আরও একটি শক্তি আছে, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলেই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। এটি বড় সাধারণ শক্তি নহে। এ শক্তি না থাকিলে অনেক গ্রন্থকার মারা যাইতেন।...এই শক্তির প্রভাবেই বঙ্কিম বাবু আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে এক যবন-তনয়ার মুখ হইতে অধুনাতন ইউরোপীয় সুসভ্য জাতীয় কামিনীগণের ভাষা অবলীলাক্রমে নির্গত করাইয়াছেন। এ কথা আমাদিগের বলিবার প্রয়োজন এই যে, এই গ্রন্থে উত্তরোত্তর যে সকল বিষয় বর্ণনা করিব—তাহা, হে পাঠকবর্গ! আপনাদিগের পার্থিব কর্ণ ও চর্ম্মচক্ষুর অগোচর হইলেও অমূলক নহে।"(২৪)

গ্রন্থকারের অতিকাল্পনিকতাকে তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা যে, অতি কাল্পনিকতার দোষে দুষ্ট, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তা গোপন রাখেন নি। উপন্যাসের ক্ষেত্রে রোমান্স প্রবণতা বা কল্পনার অতিরঞ্জনের একমুখী পথ চলা অবসানের জন্য যে তাঁর গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ, এখানে সেকথাও লেখক স্বীকার করেন। লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয় নি। বাংলা সাহিত্য এর ফলে যে সমৃদ্ধ হয়েছিল এই তথ্যটি আমরা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের ভাষায় বলতে পারি;—"সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রকে হিসাব হইতে বাদ দিলে, স্বদেশ ও স্ব-সমাজ হইতে উপকরণ লইয়া প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের। তাঁহার পর আরও অনেকে মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালী সমাজের চিত্র সাফল্যের সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু 'স্বর্ণলতা'র গৌরবকে কেহ ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন নাই।

তারকনাথ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন হইতেই 'স্বর্ণলতা' রচনা করিয়াছিলেন।"[২৫] বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার প্রথম দিকে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাংলা উপন্যাসের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার মহৎ উদ্যোগ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উনিশ শতকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা সাহিত্যের নানা প্রকরণে প্রতিভার ছাপ রেখেছিলেন। 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনারতরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬) ও 'চৈতালি' (১৮৯৬)-এর মতো কাব্যগ্রন্থ, 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২), 'বিদায় অভিশাপ' (১৮৯৪), 'কাহিনী' (১৯০০), 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'মালিনী' (১৮৯৬)-এর মতো নাটকজাতীয় রচনা ও নাটক, তাছাড়া হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত 'দেনাপাওনা', 'পোষ্টমাষ্টার' প্রভৃতি গল্পে তাঁর প্রতিভা বিস্ময়কর। 'বউঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩), ও 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস প্রকরণে প্রতিভা প্রকাশের প্রাথমিক রূপ। অবশ্য লেখক 'বউঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি'র মতো উপন্যাসকে 'কাঁচাবয়সের' রচনা বললেও এর মূল্যকে অস্বীকার করেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে আদর্শ করে রবীন্দ্রনাথ 'বউঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) লেখেন। এখানে লেখক বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে ঐতিহাসিক রস সৃষ্টিতে যত্নশীল হন। তিনি প্রতাপাদিত্যকে নিষ্ঠুর, অবিবেচক-হিংস্র চরিত্র হিসাবেই গড়ে তোলেন। প্রথম দিকে উপন্যাস লিখতে গিয়ে তরুণ লেখক রবীন্দ্রনাথ হয়ত কৃতিত্বের সঙ্গে সাফল্য পান নি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক রস সৃষ্টিতে তাঁর অংশগ্রহণ উপন্যাস নামক প্রকরণটির উন্নতির কথাই মনে করিয়ে দেয়। শুধুমাত্র স্বদেশপ্রেমের উত্তেজনাপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি না করে সাহিত্যের মান উন্নয়নের জন্য নিরপেক্ষভাবে ঐতিহাসিক রস সৃষ্টির প্রয়াস 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটির সূচনায় বলেন;—

"এই উপলক্ষে একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময় বাংলাদেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনো তার নিবৃত্তি হয় নি। আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা-কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে সময়কার ইতিহাস-লেখকদের উপরে পরবর্তীকালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনো তাঁর পূজা প্রচলিত হয় নি।"(২৬)

রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক রস সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। দেশপ্রেমের উত্তেজনার চেয়ে নিরপেক্ষ তথ্য পরিবেশনের দ্বারা সাহিত্যরস সৃষ্টি করা তাঁর কাছে শ্রেয় মনে হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই উপন্যাসটির প্রশংসা করলে সেদিনের তরুণ লেখক অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেকদিন পরে বলেন;—

"বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, বইটি যদিও কাঁচাবয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে—এই বইকে তিনি নিন্দা করেন নি। ...তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।"(২৭)

আমরা লক্ষ করব, এই উৎসাহ বাংলা সাহিত্যকে ভবিষ্যতে সমৃদ্ধ করার পক্ষেই রায় দিয়েছে। 'বালক' পত্রিকার তরুণ লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর 'বালক' পত্রের দাবী ছিল গল্পের জোগান দেওয়া। পত্রিকার এই দাবী রবীন্দ্রনাথকে সবসময় তাড়া করে বেড়াত। অবশ্য লিখে বাঙালী পাঠককে রসতৃপ্ত করার বাসনাও তাঁর ছিল। লেখকের ভাষায়;—

"বালক পত্রের সম্পাদিকা আমাকে ঐ মাসিকের পাতে নিয়মিত পরিবেশনের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তার ফল হল এই যে, প্রায় একমাত্র আমিই হলুম তার ভোজের জোগানদার। একটু সময় পেলেই মনটা 'কী লিখি' 'কী লিখি' করতে থাকে।"(২৮)

উপন্যাসের মূল ভাববস্তু হল অহিংসা ধর্মের সঙ্গে শক্তি পূজার হিংস্রতার বিরোধ। 'রাজর্ষি' উপন্যাসে শক্তিপূজায় প্রচলিত বলিদানের মতো পাশবিক বৃত্তির পরিবর্তে অহিংস ধর্মের জয়ের মতো নীতিকথা ব্যক্ত হয়েছে। খাতায় কলমে রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকে 'করুণা', 'বউঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' রচনা করেছিলেন। তিনটি উপন্যাসই বঙ্কিমের রোমান্স রসের প্রভাবযুক্ত। এই শতকে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস লিখে হাত পাকিয়েছেন,

কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্য পেয়েছেন বিশ শতকের গোড়ায় 'চোখের বালি'তে (১৯০৩)। কিন্তু প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার বাসনা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে পারি।

অতএব উনিশ শতকের উপন্যাস নামক অভিনব সাহিত্য প্রকরণটিকে প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেন। এই সময়কার লেখকগণের আন্তরিক সদিচ্ছা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে সমৃদ্ধি এনে দেয়, যে সদিচ্ছাকে আমরা বাঙালীর স্বদেশ ভাবনা বলে দাবী করতে পারি। কেননা, বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের উন্নয়ন করার আন্তরিক প্রয়াস বাঙালীর সাহিত্য সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে।

পূর্বে 'উনিশ শতকের নাট্যসাহিত্যে (নাটক ও প্রহসন) স্বদেশ ভাবনা' নামক অধ্যায়ে জাতীয় প্রেরণায় বাংলা নাটকের আলোচনায় বাঙালীর জাতীয়তাবোধ সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছিল। আমরা উল্লেখ করেছি, শিক্ষিত সচেতন বাঙালী, দেশীয় কৃষক, দেশীয় সিপাহী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বা ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার বৈষম্যের প্রতি ক্রমশ অসন্তোষের বৃত্তান্ত। দেশের কৃষক, সেনা ও শিক্ষিত এবং সচেতন ব্যক্তির মনে শাসকের প্রতি অসন্তোষ সমকালীন বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল।

এই সময় সরাসরি শাসক বিরোধী কোন গ্রন্থ রচনা নিষিদ্ধ ছিল। আমরা জানি— দীনবন্ধু মিত্র ''নীলকর বিষধর দংশন কাতর প্রজানিকরক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীত'' ছদ্মনামে 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকটি প্রকাশ করেন। 'নীলদর্পণ'-এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করার জন্য পাদ্রী লং সাহেবের কারাবাস ও অর্থদণ্ড হয়েছিল। অর্থাৎ সরাসরি শাসক বিরোধী বক্তব্য প্রকাশে সমকালীন লেখক সরকারী বিধিনিষেধ মেনে চলতেন। আবার শাসকের জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল নীতির বিরুদ্ধে কবি ও লেখক সমকালীন পাঠককে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব পালন করতে পিছিয়ে থাকেন নি। উপন্যাসে হয়ত প্রত্যক্ষ শাসক বিরোধী বক্তব্য নেই। তবে স্বাধীনতা হরণকারী বিদেশী শাসকের পরোক্ষে সমালোচনা রয়েছে। আমরা লক্ষ করব, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রমুখ লেখকের রচনায় এই জাতীয় মনোভাব বেশ সক্রিয়। তাঁদের রচনায় জাতিকে দেশানুরাগে দীক্ষিত করার মহৎ উদ্যোগ রয়েছে। এই সময়ে সচেতন বাঙালী স্বদেশীয় আচার সংস্কৃতির প্রতি ক্রমশ আস্থাবান হন। তাঁরা বিদেশীয় আচার সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণকারী হয়ে থাকতে চাইলেন না। কেননা, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এমন একটি ক্ষমতা আছে যা জীবনের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে পারে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (১৮৪৩) ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবময় দিক তুলে ধরা হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্ম কথা' বিষয়ে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন;—

"ডফ্ সাহেব তাঁর তেত্রিশ বৎসর খ্রিষ্টধর্ম প্রচার কার্যের (১৮৩০-১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের) মধ্যে দুইবার য়ুরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করেন। ...১৭৫৬ শকে (১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে) প্রথমবার স্বদেশে ফিরে যান এবং সেখানে ১৭৬১ শকে (১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে) India and India's Missions (ভারত ও ভারতের ধর্মসম্প্রদায় সকল) প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম এবং তৎসম্বন্ধে কৃতজ্ঞতার পাশ কাটিয়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তীব্র আক্রমণ ও কটুক্তি বর্ষণ করতে কুণ্ঠিত হন নি।

এই ঘটনায় দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে খুবই আঘাত লেগেছিল। তাঁর হৃদয়ে ডফ্ সাহেব কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজের প্রতি নিন্দাবাদের প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু সে সময়ে না ছিল এমন কোনও কাগজ যাতে তিনি আপনার মনোভাব সকল ব্যক্ত করতে পারতেন, আর না ছিল এমন কোনও বন্ধু বান্ধব যাদের সঙ্গে তিনি এবিষয়ে পরামর্শ করতে পারতেন। ১৭৬১ শকে (১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে) তত্ত্ববোধিনী সভা সবেমাত্র স্থাপিত হয়েছিল। পরে যখন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্মিলনের ফলে তত্ত্ববোধিনী সভা সুপ্রতিষ্ঠিত হল এবং সেই সঙ্গে অন্তত ছোটখাটো একটি দল বেঁধে গেল, তখন দেবেন্দ্রনাথ একখানি মাসিকপত্র প্রকাশের প্রস্তাবে সাহসী হলেন। এই পত্রিকার নাম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ১৭৬৫ শকের ১লা ভাদ্র ইহার শুভ জন্মদিবস।"[২৯]

আমরা জানলাম, ভারতীয় ধর্ম, দর্শন অপমানের প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের বৃত্তান্ত। 'হিন্দুমেলা'-ও (১৮৬৭) জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরব প্রচার মূলক একটি সংগঠন। এই মেলায় কৃষি, চিত্র, শিল্প, ভাস্কর্য, খেলাধূলা, ব্যায়াম প্রভৃতির আয়োজন ও দেশীয় জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হত। বাঙালী লেখক সমকালের এই জাতীয় মনোভাবে সিক্ত ছিলেন। তাঁরা স্বজাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির মধ্যে জাতীয় গৌরবকথা খুঁজে তা প্রচার করার চেষ্টা করতেন। আপামর বাঙালীর আত্মবিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলার পক্ষে যা যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল।

আমরা স্বদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি গৌরবমূলক যে সব উপন্যাসের পরিচয় পেয়েছি সেগুলিকে জাতীয় প্রেরণামূলক উপন্যাস বলে অভিহিত করব। জাতীয় প্রেরণামূলক উপন্যাসের দু'টি ভাগ করা যেতে পারে। যথা;—ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ভারতীয় দর্শন বা তত্ত্বের অবতারণামূলক উপন্যাস।

উনিশ শতকে ঔপন্যাসিক স্বদেশীয় ইতিহাসের গৌরবময় দিকগুলি উদ্ঘাটন করে সমকালের পাঠককে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমে ঐতিহাসিক বা কল্পনা মিশ্রিত ইতিহাসমূলক

উপন্যাসে জাতীয়তাবাদের আবেদন বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' ও 'রাজসিংহ'কে ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেননা, 'মৃণালিনী' উপন্যাসে হেমচন্দ্র -মৃণালিনী ও পশুপতি-মনোরমার দু'টি রোমাঞ্চকর প্রেমকাহিনী থাকলেও বাংলার প্রকৃত ইতিহাসের বিষয়টি বড় হয়ে উঠেছে। ইখ্‌তিকার উদ্দিন বিন বখ্‌তিয়ার খিলজি সহ ১৭ জন সেনাবহিনীর নিকট লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ের একটি কাহিনী রয়েছে। প্রচলিত এই ঐতিহাসিক কাহিনীকে লেখক এড়িয়ে বাস্তবসম্মত একটি কাহিনী নির্বাচন করেন। আর 'রাজসিংহ' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেন যে;— "আমি পূর্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'চন্দ্রশেখর' বা 'সীতারাম'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।"[৩০] বঙ্কিমচন্দ্র অসত্য, অধর্ম, পরনিন্দা বা স্বার্থ বিষয়ক রচনার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন— এসবকে সাহিত্যের বিষয় করলে মহৎ সাহিত্যও সৃষ্টি হবে না, আবার সমাজকেও বিপথে চালিত করা হবে। সেজন্য তিনি 'বিবিধপ্রবন্ধ'-এর 'দ্বিতীয় খণ্ড'-এ 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' নামক প্রবন্ধে বলেছিলেন;—"যাহা অসত্য, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, ...তাহা একেবারে পরিহার্য্য।"[৩১] দেশের বা সমাজের ক্ষতি হবে এমন সব বিষয়কে তিনি সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়েছেন। 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) ও 'রাজসিংহ' (১৮৮২, ৪র্থ সংস্করণ ১৮৯৩) উপন্যাস দু'টির বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রে কল্পনা প্রবণ বলে মনে হতে পারে; কিন্তু সাহিত্যের বাস্তবতা বা মূল ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করে নি। আপাত কল্পনা বলে মনে হওয়া বিষয়গুলি মিথ্যা, পরনিন্দা, ধর্ম বিরুদ্ধ বা স্বার্থ সাধন জাতীয় নয়। বরং বলা যায়, ওই সব বিষয়গুলি জাতি ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর হয়েছে।

'মৃণালিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের দেশানুরাগমূলক উপন্যাস। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় শৌর্যবীর্য ও আত্মত্যাগের অধিকারী হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাধবাচার্যের স্বাজাত্যপ্রীতির উত্তপ্ত ভাষণ ও একনিষ্ঠতা যেন সেদিন পরাধীন জাতিকে পথ দেখিয়েছে। যথা;— "তুমি দেবকার্য্য না সাধিলে কে সাধিবে? তুমি যবনকে না তাড়াইলে কে তাড়াইবে?"[৩২] — নায়ক দেশমাতৃকার মহৎ কাজে বিমুখ হতে চাইলে মাধবাচার্য বলেন;—"নরাধম! তোমার জননী কেন তোমায় দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল?"[৩৩] কিংবা "তুমি কাপুরুষ যদি না হও, তবে তুমি কি প্রকারে শত্রু শাসন হইতে অবসর পাইতে চাও? এই কি তোমার বীরগর্ব্ব? এই কি তোমার শিক্ষা? রাজবংশে জন্মিয়া কি প্রকারে আপনার রাজ্যোদ্ধারে বিমুখ হইতে চাহিতেছ?"[৩৪]

বাংলার বিকৃত ইতিহাসের সাহিত্যিক প্রতিবাদ 'মৃণালিনী'। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র মেনে নিতে পারেন নি ১৭ জন অশ্বারোহী বাংলাকে পরাজিত করেছিল। বরং তিনি বলতে চেয়েছেন,—ছলনা ও যথেষ্ট কৌশলের দ্বারা লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন। লেখক বলেছেন;—

"ষোড়শ সহচর লইয়া মর্কটকার বখ্‌তিয়ার খিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল। ষষ্ঠি বৎসর পরে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিন্‌হাজ্‌উদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে?[৩৫]

ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দীনের লেখা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টই সন্দেহ পোষণ করেছেন।১৭ জন অশ্বারোহী কর্তৃক বাঙালীর পরাজয়ের কলঙ্ক যে অতিরঞ্জিত সেকথা উপন্যাসের বক্তব্যে স্পষ্ট। বঙ্গভূমির অদৃষ্ট খুব একটা ভাল নয় লেখক এবিষয়ে লিখেছেন;—"বঙ্গভূমির অদৃষ্টলিপি এই যে, এ ভূমি যুদ্ধে জিত হইবে না; চাতুর্য্যেই ইহার জয়। চতুর ক্লাইভ সাহেব ইহার দ্বিতীয় পরিচয়স্থান।"[৩৬]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুধুমাত্র দেশের ইতিহাস ও পরাধীনতার গ্লানির কথা শুনিয়ে নীরব থাকেন নি, তিনি প্রসঙ্গত লোকশিক্ষা বা নৈতিকতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মৃণালিনী, হেমচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী। কিন্তু সে বিয়ে ছিল গোপন। হেমচন্দ্রের সংকেতের আংটি দেখে মৃণালিনী বাগানের পিছনে যায় দেখা করতে। এখানেই মৃণালিনী অপহৃত হয়। মণিমালিনী, মৃণালিনীর বিবাহের সংবাদ জানত না, সেজন্য সখি মণিমালিনী বলেছে;—"তুমি কুমারী হইয়া কি প্রকারে পুরুষের সহিত গোপনে প্রণয় করিতে?"[৩৭] মণিমালিনীর ধারণা ছিল— সম্মান, সতীত্ব, লজ্জা নামক বিষয়গুলি বর্জন করে মৃণালিনী পুরুষের সঙ্গে মিলিত হত। এখানে অবিবাহিতা মেয়ের পুরুষের প্রতি অবৈধ আসক্তির সামাজিক বিধিনিষেধের কথা স্পষ্ট।

'মৃণালিনী' উপন্যাসে মনোরমা-পশুপতি উপাখ্যান স্বামীর প্রতি স্ত্রীর নিষ্কাম প্রেম ও ভক্তির সার্থক দৃষ্টান্ত রয়েছে। স্বামী আদর্শচ্যুত, পথভ্রষ্ট হলেও স্ত্রীর নিকট দেবতা। স্বামীর দেবত্বকে স্বীকার করে নিয়ে স্ত্রীও যে মানুষ, তারও ভালমন্দবোধের সমান মূল্য রয়েছে, এখানে মনোরমা-পশুপতি উপাখ্যানে তার পরিচয় মেলে। মনোরমা বিধবা পরিচয়ে স্বামী পশুপতির আহ্বানে সাড়া দেয় নি। এখানে মনোরমার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। আবার মনোরমা সেই পশুপতির মৃত্যুতে সহমরণে গমন করেছে। এ যেন একাধারে উগ্র আধুনিকা ও সংকীর্ণ সমাজের প্রতি প্রয়োজনীয় নৈতিক পথ প্রদর্শন।

'রাজসিংহ' উপন্যাসে ঔরঙ্গজেবের সমকালের মুঘল ইতিহাসকে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনী হিসাবে গ্রহণ করেন। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে দেশবাসী সর্বাধিক নির্যাতিত হয়েছিল। ইতিহাসের মুঘল যুগের সময়ের কাহিনী দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকে পরাধীন বাঙালীর জাতীয়তাবোধ জাগরণের চেষ্টা করেন। ভারতবাসীর 'বাহু'তে শক্তি নেই, তাই তারা যুগ যুগ ধরে বিদেশীর অর্থাৎ শক, হুণ, পাঠান, মোগল, ইংরেজের কাছে পরাজিত। এরকম একটি ভ্রান্ত ধারণা ঊনবিংশ শতকের অনেক ভারতবাসীর মনে বিরাজ করত। কিন্তু 'রাজসিংহ'-

এর গ্রন্থকার বঙ্কিম এজাতীয় ভ্রান্ত ধারণা উড়িয়ে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন;—"ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই।"[৩৮] লেখক জাতির গৌরবময় ইতিহাস না থাকার অন্যতম কারণ নির্ণয় করে বলেন;—"মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা অত্যন্ত স্বজাতি-পক্ষপাতি; হিন্দুদ্বেষক। হিন্দুদিগের গৌরবের কথা প্রায় লুকাইয়া থাকেন— বিশেষতঃ মুসলমানদিগের চির শত্রু রাজপুতদিগের কথা।"[৩৯] স্বদেশবাসীর বাহুবলের বিস্মৃতিকে বঙ্কিমচন্দ্র-রাজসিংহ উপন্যাসে স্মরণ করেছেন।

'রাজসিংহ' উপন্যাসে দেশহিতৈষী, বীর, ধর্ম্মাত্মা রাজসিংহের জয় এবং 'নিষ্ঠুর' 'কপটচারী' 'ক্রূর', 'দাম্ভিক', 'আত্মমাত্রহিতৈষী' এবং প্রজা পীড়ক ঔরঙ্গজেবের চরম অপমান দেখানো হয়েছে। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে দেশীয় সংস্কৃতি, ধর্ম জীবন সবই সঙ্কটাপন্ন। দেশে রাজাজ্ঞা প্রচারিত হয়েছিল—'জেজেয়া'কর দিতে হবে, গোহত্যা করতে হবে, দেবালয় ভাঙ্গতে হবে। বাহুবলের সাহায্যে সেদিন দেশবাসী বিপর্যস্ত দশা থেকে মুক্তির উদ্যোগ করেছিল।

উপন্যাসের সূচনাতে দেশ ও জাতির শত্রু ঔরঙ্গজেবের চিত্রে লাথি মেরে মনের আশ সামান্য হলেও মিটিয়েছে রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চল কুমারী। 'ধর্ম্মাত্মা' রাজসিংহ ঔরঙ্গজেবের অন্যায় ও নিষ্ঠুর আদেশ মেনে নেন নি। সম্রাটের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রাজসিংহ বিচলিত না হয়ে কৌশলে বাহুবলের সাহায্যে শত্রু ঔরঙ্গজেবকে উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুঃখ করে বলেন;—"এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুদিগের বাহুবলের কোন চিহ্ন দেখা যায় না।"[৪০] উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করে লেখেন;—"আমরা গ্রীক ইতিহাস মুখস্থ করিয়া মরি—রাজসিংহের ইতিহাস কিছুই জানি না।"[৪১] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাজসিংহের গৌরবময় ইতিহাস প্রচার করে জাতির আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। তিনি স্বদেশীয় গৌরবময় ইতিহাস উপন্যাসের আকারে প্রচার করে পাঠককে জাতীয় গৌরব সম্বন্ধে সচেতন করার চেষ্টা করেন। বাঙালীকে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করার পক্ষে যা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

রাজসিংহ উপন্যাসে সমাজশিক্ষা বা লোকশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'রাজসিংহ' প্রকাশ সম্বন্ধে 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ'-এ লিখেছেন—রাজসিংহ বঙ্গদর্শনে কিছুটা প্রকাশ হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্রকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেন;—"আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে এখনকার ছেলেপুলে মাটি হইতেছে। তাই আর ডাকাত মাণিকলালকে আঁকিতে ইচ্ছা করে না।"[৪২] সেদিন চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রীশমজুমদারও বলেছিলেন;—"মাণিকলালের মত দুএকটা ডাকাতের চিত্র দেশের সম্মুখে ধরিলে উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না।"[৪৩] শ্রীশচন্দ্র বলেন এরকম কথোপকথনের কিছুদিন পর পুনরায়

রাজসিংহ প্রকাশ হতে লাগল। খুন, ডাকাতি প্রভৃতি অবশ্যই অনৈতিক, সেজন্য প্রথম থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' প্রকাশে সংকোচ বোধ করেছিলেন। কোন এক বন্ধু তাঁর মনের ওই কথাটি বলে দেওয়ায় 'রাজসিংহ'-এর প্রকাশ বন্ধ করে দেন। কিন্তু শ্রীশচন্দ্র, চন্দ্রশেখর প্রমুখের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝলেন যে, রাজসিংহ প্রকাশ পেলে দেশের 'ছেলেপুলে'র পক্ষে উপকার হতে পারে। ফলে আর অপেক্ষা না করে রাজসিংহের প্রকাশ করেন। 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ'-এ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এরকম বক্তব্যই প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্র অঙ্কন করে 'উপসংহার'-এ 'গ্রন্থকারের নিবেদন' অংশে বলেছেন;—"অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ।"[৪৪] উপন্যাসে যাঁরা ন্যায় পরায়ণ, ধার্মিক তাঁদের পরিণতি শুভ হয়েছে এবং যারা অধার্মিক অন্যায়কারী তাদের পরিণতি হয়েছে অশুভ। মবারক বীর, কিন্তু তার চরিত্র নিষ্কলুষ থাকেনি। চরিত্রটি বিবেকদংশনে আহত। জেব উন্নিসা ঔরঙ্গজেবের কন্যা; সে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নিষ্ঠুর ও অহংকারী। উপন্যাসের পরিণতিতে সে ভালবাসার নীড় গড়তে চেয়েছে কিন্তু পায়নি। ঔরঙ্গজেবের প্রেয়সী উদিপুরী বেগম আত্ম অহংকারী ও নিষ্ঠুর। কাহিনী শেষে তার অহংকার ধুলিলুণ্ঠিত। রাজসিংহ উপন্যাসে সত্য, ধর্ম, নৈতিকতা বা লোকশিক্ষার মতো বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে প্রকাশ করে সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যকে সফল করার সচেতন প্রয়াস দেখা যায়। আর তাই তিনি গ্রন্থশেষে আপামর পাঠক ও সমালোচকদের বলতে চেয়েছেন, অহেতুক হীন উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচিত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়;—

> "গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দ্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে।"[৪৫]

উনিশ শতকে আর এক স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৭-১৯০৯)। রমেশচন্দ্র দত্তের বাংলা সাহিত্যচর্চার পিছনে দু'টি উদ্দেশ্য চোখে পড়ার মতো। বাঙালীর আত্মচেতনার উদ্বোধন ঘটানো ও বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি দান। এখানে বাঙালীর জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্বোধনে তাঁর ভূমিকার বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতের গৌরবময় ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মত প্রাচীন ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা

করতেন। এবিষয়ে তাঁর বিখ্যাত কিছু গ্রন্থ হল;—

১। A History of Civilisation in Ancient India. 1-3, Cal. 1889–1890

২। Maha Bharata. : London–1899

৩। Ramayana : London–1900

৪। Lays of Ancient India : London–1894

৫। The Literature of Bengal : Ar Cy Dae. Cal.–1877

৬। ঋগ্বেদ সংহিতা, ১৮৮৫।

৭। হিন্দুশাস্ত্র (১৮৯৩-১৮৯৭) প্রভৃতি ।

প্রাচীন ভারতের সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুরাগ বিষয়ে তিনি 'ঋগ্বেদ সংহিতা'র ভূমিকায় বলেছিলেন;— "...জগতের আর্য্য জাতিদিগের মধ্যে কেবল কি আমরাই এই অপূর্ব্ব কাব্য রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিব? এই অসহ্য চিন্তায় ব্যথিত হইয়া আমি এই গুরু কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।"[৪৬] প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ যে আরো সুদূরপ্রসারী— তা লেখকের স্বীকৃতি থেকেই জানা যাবে। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর অনুরাগকে পাঠকের জাতীয় চেতনা জাগরণের কাজে ব্যবহার করতে যত্নবান ছিলেন। তিনি বলেছেন;—

> "নব্য পাঠক! ইলিয়দ ও ইনিয়দ পাঠ করিয়াছ, দান্তে ও সেক্সপীয়র, গেতে ও হিউগো পাঠ করিয়াছ, সাদী ও ফরদুসী পাঠ করিয়াছ, কিন্তু হৃদয় অন্বেষণ কর হৃদয়ের অন্তরে কোন্ কথাগুলি সরসভাবপূর্ণ বোধ হয়? হৃদয় কোন্ কথায় অধিকতর আলোড়িত, প্রোৎসাহিত বা মুগ্ধ হয় ? ভীষ্মাচার্য্যের অপূর্ব্ব বীরত্ব-কথা, দুঃখিনী সীতার অপূর্ব্ব পাতিব্রত্য-কথা হিন্দু মাত্রেরই হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে,"[৪৭]

লেখক দেশের গৌরবময় ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রচারে মুগ্ধ ও গর্বিত হতেন। তাঁর এই মানসিক তৃপ্তি দেশকে ভালবাসারই নামান্তর। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশীয় গৌরবকথায় পাঠক অনুপ্রাণিত হবে। তাঁর সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য যে অন্য কিছু নয়, তা তিনি গোপন রাখেন নি। প্রকাশ্যে তিনি স্বীকার করেছেন;—

"পাঠক! একত্র বসিয়া এক একবার দেশীয় গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছি। যদি সেই সমস্ত কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি তবেই যত্ন সফল হইয়াছে, নচেৎ আমার পুস্তকগুলি দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে না।"[৪৮]

রমেশচন্দ্র 'বঙ্গ বিজেতা' (১৮৭৪), 'মাধবী কঙ্কণ' (১৮৭৭), 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' (১৮৭৮) ও

'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' (১৮৭৯) নামে চারখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন। উপন্যাসগুলির আবেদন পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করে। এবার আমরা উপন্যাসগুলিতে লেখক রমেশচন্দ্র দত্তের স্বদেশ ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করব ।

বঙ্গবিজেতা (১৮৭৫) ঃ

উপন্যাসের মূল সমস্যার কথা লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত স্বয়ং একটি স্থানে প্রকাশ করেন;—

"১৫৮০ খৃষ্টাব্দে টোডরমল্ল সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে প্রেরিত হইলেন। কি প্রকারে এই নিঃশঙ্ক বীরপুরুষ তৃতীয়বার বঙ্গদেশ জয় করিয়া দুই বৎসরকাল বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ শাসন করেন, তাহা এই আখ্যায়িকায় বিবৃত হইবে। এই আখ্যায়িকায় ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের কথা লিখিত হইবে, সুতরাং সেই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান, জমীদার ও প্রজা, পাঠান ও মোগলদিগের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল, সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।"[৪৯]

ঔপন্যাসিকের স্বীকারোক্তি থেকেই স্পষ্ট— উপন্যাসের মূল বিষয় ঐতিহাসিক।

কিন্তু রমেশচন্দ্র দত্ত উপন্যাসে শুধুই ইতিহাসকে বিবৃত করবেন,— তা হতে পারে না। 'বঙ্গবিজেতা' মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে দেখা যাবে, উপন্যাসটি কানায় কানায় জাতীয় গৌরব কথা, দেশানুরাগের কথা ও লোকশিক্ষার কথায় পরিপূর্ণ।

জাতীয় গৌরব কথা ঃ

উপন্যাসের সূচনায় জানা যায়, বাংলায় হিন্দুরাজত্বের পতন হয় ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলায় মুঘলরাজের পূর্বে পাঠান রাজত্বে রাজকীয় কার্যে হিন্দুসম্প্রদায়ের অনেকেই অংশ নিত। ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দেখিয়েছেন এইসব বাঙালী হিন্দুবীরের সহযোগিতায় টোডরমল্ল বাংলাকে তৃতীয়বার মুঘলসাম্রাজ্য ভূক্ত করেন। উপন্যাসের চরিত্র সমরসিংহ সেকালের বাঙালী বীরের প্রতিনিধি। পাঠান রাজ দাউদ খাঁ সমরসিংহের বীরত্ব প্রসঙ্গে বলেন;— "প্রথম ক্ষত্রিয়কুলচূড়ামণি রাজা টোডরমল্ল, দ্বিতীয় বঙ্গীয় জমীদার রাজা সমরসিংহ।"[৫০] সমর সিংহ যুদ্ধকালে বীরত্ব ও সাহস দেখিয়েছেন। অর্থাৎ বাংলা তৃতীয়বার মুঘল শাসন ভূক্ত হবার মূলে দেশীয় হিন্দুবীরের অবদানের কথা বলা হয়েছে।

উপন্যাসটিতে দেশীয় বীরকুলের সশ্রদ্ধ প্রশংসা ধ্বনিত হয়। ইন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, টোডরমল্ল হিন্দুবীরকুলে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তার ভাষায়;—"আপনার ন্যায় গৌরবান্বিত নাম ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের মধ্যে

কাহারও নাই, আপনার ন্যায় গৌরবের কার্য্য কেহ সাধন করে নাই।"[৫১] এদিকে টোডরমল্লের মনে হয়েছে;—

> "প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতায় যেরূপ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া পর্ব্বতকন্দরে ও মরুভূমিতে বাস করিয়া বৎসর বৎসর আকবরের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ দান করিতেছেন তাহাতে আকবর শাহ স্বয়ং বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছেন।"[৫২]

'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসে লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত দেশীয় বীরের গৌরবগাঁথা গেয়ে পাঠককে যেন বলতে চেয়েছেন আমাদের দেশ অতীত ঐতিহ্যে পূর্ণ।

দেশানুরাগ ঃ

বাঙালী দীর্ঘদিন পরাধীন ছিল (১২০৪-১৯৪৭, ১৯৭১)। আলোচ্য 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসে পাঠান জাতির হাত থেকে মুঘল জাতির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাহিনী আছে। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে,— হিন্দুবীর টোডরমল্ল পাঠান জাতির হাত থেকে মুঘল জাতির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটিয়ে আদৌ কোন মহৎ কাজ করেছেন কি না। দেশীয় প্রজা সাধারণ তো আর স্বাধীন হতে পারল না। রাজা টোডরমল্ল, এদেশের জায়গীরদার ও জমিদারদের নিকট দেওয়ানজী সতীশচন্দ্রের মুখ দিয়ে বলান;—

> "আকবরশাহ পরম বন্ধু; হিন্দুদিগের উপর অন্যায় কর সমূহ উঠাইয়া দিয়াছেন; হিন্দুদিগের শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন; হিন্দু রমণী বিবাহ করিয়াছেন; হিন্দুদিগের আচারব্যবহার কোন কোন অংশে অবলম্বন করিয়াছেন; বঙ্গদেশে হিন্দু সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন;"[৫৩]

এরকম উদার ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী সম্রাটের অধীন হওয়া বঙ্গবাসীর জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধিকে বরণ করার নামান্তর।

লোকশিক্ষা ঃ

রমেশচন্দ্র দত্ত বিলাসী পাঠকের জন্য কলম ধরেন নি। পাঠকের আত্মবিকাশ ঘটাতে তিনি লোকশিক্ষা বা নীতিশিক্ষার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেন। স্বয়ং লেখক নগেন্দ্রনাথ চরিত্র প্রসঙ্গে বলেন—"...কিন্তু যদি একজন ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করিতে পারি, একজন তৃষ্ণার্ত্তকে স্নেহবারি দিয়া তুষ্ট করিতে পারি, একজন অনাথিনীর নয়নজল মোচন করিতে পারি, তবে একার্য্য ক্ষেত্রে আমরা বৃথা জন্মধারণ করি নাই।"[৫৪] এখানে রমেশচন্দ্র দত্ত পাঠককে মানবিক অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন। 'পাপিষ্ঠে' নামক সপ্তম পরিচ্ছেদে লেখক বাহ্যসম্পদ অর্থ, বিষয়, বা প্রতিপত্তির প্রতি আমাদের চঞ্চল মনকে শান্ত করার জন্য বলেন;—

"পাঠক যদি আমাদের মত দরিদ্র লোক হয়েন, যদি ঈর্ষাপরবশ হইয়া কখন "বিষয়ী" লোকের বিষয়ের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, কখন যদি সতৃষ্ণ নয়নে রাস্তা হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া বাবুর বৈঠকখানার ঝাড়লণ্ঠনের প্রতি নয়নপাত করিয়া থাকেন, যদি কখন অর্থের আবাসস্থানকে সুখের আবাসস্থান মনে করিয়া থাকেন, তবে আসুন একবার লক্ষপতি সতীশচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া মন শান্ত করি,— লোভ দূর করি।"[৫৫]

সতীশচন্দ্রের বিষয়ই যে সতীশচন্দ্রের সমস্ত সর্বনাশ ডেকে এনেছে লেখক তার বর্ণনা দিয়ে পাঠককে বাহ্যসুখের জন্য লোভী হতে বারণ করেন।

এছাড়া উপন্যাসের শেষে গঠনমূলক মানসিকতার জয় হয়েছে। প্রজাদরদী সুশাসক আকবর বাংলার অধিপতি হয়েছেন, ইন্দ্রনাথ তথা সুরেন্দ্রনাথের মতো প্রজাদরদী মানুষ 'জমীদার' হয়েছেন। আর বিমলা তার রূপযৌবনের চর্চা ত্যাগ করে পরোপকার ও ঈশ্বরে ভক্তিমতি হয়েছে। উপন্যাসের শেষে গঠনমূলক মনোভাব পাঠককে একটি ধর্মপ্রাণ, সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র ও সমাজের কথা মনে করিয়ে দেয়।

'মাধবীকঙ্কন' (১৮৭৭) ঃ

উপন্যাসের মূল সমস্যা নরেন্দ্র-হেমলতা-শ্রীশচন্দ্রের ত্রিকোণ প্রেম। কিন্তু উপন্যাসের শেষে এই ত্রিকোণ প্রেমের সমস্যাতেই পাঠক আবদ্ধ থাকে না, পাঠকের মন লেখকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনে নীতিশিক্ষা এবং দেশীয় গৌরবকথায় আকৃষ্ট হয়।

নীতিশিক্ষা ঃ

'মাধবীকঙ্কন' উপন্যাসে নারী ও পুরুষের ধর্ম নির্দেশিত হয়েছে। নারীর ধর্ম যে 'পতিব্রতা', অনেক দোলাচল বৃত্তির পর হেমলতা সেকথা বুঝেছে। লেখকের ভাষায়;—"পতিসেবায় ধর্ম্মপরায়ণা হেমের অন্য চিন্তা তিরোহিত হইল, পতিভক্তি ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম তিনি জানিতেন না।"[৫৬] এবং আদর্শ পুরুষের ধর্ম্ম দেশসেবা, শত্রুজয় ও পরোপকার সাধন — তার উল্লেখ আছে। হেমলতা নরেন্দ্রের উদ্দেশ্যে বলেছে;—"নরেন্দ্র! আমি চলিলাম, তুমি ধর্ম্ম পরায়ণ, বাল্যকাল হইতেই তোমার ধর্ম্মে আস্থা আছে, ...নরেন্দ্র, তুমি বীরপুরুষ, শত্রুকে জয় কর, দেশের মঙ্গল কর, পদাশ্রিত ক্ষীণের প্রতি দয়া করিও।"[৫৭] উপন্যাসটিতে অবৈধ প্রেমের সমস্যা মুখ্য হলেও লেখক সমাজ শিক্ষার জন্য তার স্বীকৃতি দেন নি। লেখক হেমলতা-নরেন্দ্রের আকর্ষণকে স্বীকৃতি দেন নি। বরং নরেন্দ্রকে কাম, ক্রোধ, লোভ শূন্য জীবন সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষিত করেছেন। তাছাড়া জেলেখার সঙ্গে নরেন্দ্রের অবৈধ প্রেম শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি পায় নি।

দেশীয় গৌরবকথা ঃ

নায়ক নরেন্দ্র 'চিতোরের' চারণ কবির রাজপুত মাহাত্ম্য শুনে স্বদেশের কথা মনে হয়েছে। তার ভাষায়;— "স্বদেশও মহাবল পরাক্রান্ত রাজারা আছেন, তবে সুন্দর বঙ্গদেশের এ দুর্দ্দশা কেন?"[৫৮] বলা বাহুল্য এরকম মনোভাব বঙ্গবাসীকে জাতীয় জীবনের বিষয়ে আত্মসমীক্ষা করতে প্রেরণা দেয়। লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত বাঙালীর বীরত্বের কথা বলবেন না, এ হতে পারে না। তিনি নরেন্দ্রের পিতা বীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রসঙ্গে বীরত্বের জয়গাঁথা গেয়েছেন। এর্ফান নামক এক কর্মচারী বলেন—"এই রাজসভায় অনেক পরাক্রান্ত পাঠান ও মোগল যোদ্ধা আছেন, কিন্তু বীরেন্দ্র অপেক্ষা অধিক সাহসী পুরুষ এ গোলাম এ পর্য্যন্ত দেখে নাই।"[৫৯] রাজপুত ও বীরত্ব আগুন এবং উত্তাপের মতো সম্পর্কযুক্ত । রাজপুত বীর গজপতিসিংহ মুঘল স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রসঙ্গে বলেন;— "যতদিন বীরত্বের গৌরব থাকিবে, রাজপুত নাম কেহ বিস্মৃত হইবে না।"[৬০] বীরত্বের বিষয়টি রাজপুত রমণীদের কাছেও খুব আদরণীয় ছিল। 'যোধপুর' নামক পরিচ্ছেদে যোধপুর রাজ্ঞীর বীরাঙ্গনা রূপ সেকথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজা যশবন্ত সিংহের সাময়িক যুদ্ধ বিরতিকে রাজ্ঞী তিরস্কার করেছে। ফলে রাজা যশোবন্ত সিংহ পুনরায় নূতন উদ্যোগে যুদ্ধ যাত্রায় অগ্রসর হন।

স্বাধীনতা জাতির পরশমণি। এই তত্ত্বটি প্রচার করতে রমেশচন্দ্র দত্ত 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' নামক দু'খানি উপন্যাস লেখেন। লেখক যেন বলতে চেয়েছেন—স্বাধীনতা নামক অমূল্যরত্নটি কোন জাতি লাভ করলে নতুন করে জাতীয় জীবনে সূর্য উঠে আর যদি হারিয়ে যায়, তাহলে জাতীয় জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। উনিশ শতকের পরাধীন বাঙালীর জাতীয় জীবনে উপন্যাস দু'টি স্বাধীনতা নামক অমূল্যরত্নটির প্রতি আকৃষ্ট হবার বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে বলে মন্তব্য করলে অতিশয়োক্তি হবে না ।

মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত (১৮৭৮) ঃ

'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত'-এ নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে নায়ক শিবজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের স্বাধীন হবার বিষয়টি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক শিবজী, প্রতিনায়ক আরংজীব। শিবজী ব্রাহ্মণ, গোবৎসাদি, দেশের কৃষক ও হিন্দু দেবালয়ের পবিত্রতা রক্ষাকারী, দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্নে বিভোর। স্বাধীনতা হরণকারীর সঙ্গে সমস্ত প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার পরামর্শ দিয়ে শিবজী বলেন;—

> "আমাদিগের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা যে মুসলমানেরা শত শত বৎসর অবধি হরণ করিয়াছে, হৃদয়ের শোণিতস্বরূপ বল, মান, দেশগৌরব ও ধর্ম্ম বিনাশ করিতেছে, তাহাদিগের সহিত আমাদিগের সখ্যতা ও সত্যসম্বন্ধ ? তাহাদিগের নিকট হইতে যে উপায়ে সেই জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারি; স্বধর্ম্ম ও জাতি গৌরব রক্ষা করিতে পারি, সে উপায় কি চতুরতা, সে উপায় কি নিন্দনীয় ? জীবন রক্ষার্থ পলায়ণপটু মৃগের শীঘ্রগতি কি বিদ্রোহ ?"[৬১]

শিবজী তাঁর মহৎ উদ্দেশ্যের কথা যশোবন্ত সিংহকে বলেন;—"মুসলমান-শাসন ধ্বংসকরণ, হিন্দুজাতির গৌরবসাধন, স্থানে স্থানে দেবালয় স্থাপন, সনাতন ধর্ম্মের গৌরববৃদ্ধি, হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা, ব্রাহ্মণকে আশ্রয়দান, গোবৎসাদি রক্ষা করণ, ইহা ভিন্ন শিবজীর অন্য উদ্দেশ্য নাই।"[৬২] শিবজীর এই উদ্দেশ্য যে কোন স্বদেশ প্রেমিক ব্যক্তিকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করবে। প্রতিনায়ক আরংজীব দয়ামায়াশূন্য, কাব্যরসে বিরক্ত, হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসংস্কৃতি বিদ্বেষী। উদারচেতা দানেশমন্দকে আরংজীব বলেন;—"আকবরশাহ বুদ্ধিমান ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কাফের ও মুসলমানকে সমান চক্ষে দেখিয়া তিনি কি ধর্ম্মসঙ্গত আচরণ করিয়াছিলেন ?"[৬৩] কিংবা "দানেশমন্দ্! আমি তোমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ নহি! কবিতায় যাহা লিখে তাহা বিশ্বাস করি না।"[৬৪] এরকম একজন খলনায়কের বিরুদ্ধে শিবজী যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করতে চেয়েছিলেন। মৃত্যুশয্যায় দাদাজী কানাইদেব শিবজীকে বলেন;—"বৎস, তুমি যে চেষ্টা করিতেছ, তাহা হইতে মহত্তর চেষ্টা আর নাই।"[৬৫] রাজা জয়সিংহ শিবজীর অদম্য উৎসাহ, মহৎ উদ্দেশ্যের কথা শুনে বলেন;—"....অচিরে দেশে দেশে হিন্দুর গৌরব-নাম, আপনার গৌরব-নাম প্রতিধ্বনিত হইবে।"[৬৬] অনুরূপভাবে যশোবন্ত সিংহ শিবজীর মহৎ উদ্দেশ্যকে স্বাগত জানিয়ে বলেন;—"অদ্যাবধি শিবজী আমার মিত্র, আমি শিবজীর মিত্র।"[৬৭] —এরকম একটি স্বাধীনতা সংগ্রামের উপন্যাস পাঠ করলে উনিশ শতকের পরাধীন বাঙালীর মনে স্বাধীনতার কথা মনে হতে বাধ্য। বিশেষত ধর্ম ও সংস্কৃতির বিপন্নতার বিষয়টি সমকালে বিদেশী ইংরেজ রাজত্বেও প্রাসঙ্গিক ছিল। নববাবু সম্প্রদায়ের বিকৃত জীবনাচরণ আমাদের সেকথাই মনে করিয়ে দেয়। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' পাঠ করলে দেশীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, স্বাধীনতার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়।

সমকালে অনেক বাঙালী পরানুকরণে অভ্যস্ত, তারা মনে করত বাঙালীর গর্ব করার মতো কোন কিছু নেই। কিন্তু রমেশচন্দ্র দত্ত বাঙালীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন, এদেশেও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও ধর্মের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস ছিল। ভারতের মানুষও ইংরেজ বা ফরাসী জাতির মত স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' শিবজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র জাতির স্বাধীনতা অর্জনের গৌরবকথা মূলক উপন্যাস। প্রসঙ্গত শিবজীর বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা হল;—"....মহারাষ্ট্রদিগের ভাগ্যনক্ষত্র উন্নতশীল, দিল্লীর সিংহাসন ত্বরায় শূন্য! বন্ধুগণ! অগ্রসর হও, পৃথুরায়ের সিংহাসন আমরা অধিকার করিব।"[৬৮] —এখানে শিবজী সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার মহৎ কর্মে অনুপ্রাণিত হবার জন্য আহ্বান করেন। উপন্যাসটির এই জাতীয় অকৃত্রিম আহ্বান উনিশ শতকে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ছিল।

'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' (১৮৭৯) ঃ

রাজপুত জাতিতে ক্ষত্রিয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাই তাঁদের ধর্ম। ইতিহাসে তাঁদের শৌর্য-বীর্য বীরত্ব সুবিদিত। লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত এরকম একটি জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার মর্মান্তিক কাহিনী 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা'য় চিত্রিত করেছেন। মহারাণা প্রতাপসিংহ যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে মুঘল সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। কারণ একটাই, রাজপুত জাতির স্বাধীনতার পরশমণিটি সযত্নে রক্ষা করা। 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা'য় মহারাণা প্রতাপ সিংহের হার না মানা স্বাধীনচেতা মানসিকতা এবং পরবর্তী উত্তরাধিকারীর পরাধীনতাকে স্বীকার করার মতো ট্র্যাজিক কাহিনীর মধ্যে আমরা ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের জাতীয়ভাবনার প্রচার করার মনোভাব লক্ষ করি। তিনি এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে যেন স্বাধীনতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা, একতা, একনিষ্ঠতার মত অনেকগুলি প্রয়োজনীয় বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন।

স্বাধীনতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা ঃ

উনিশ শতকের বাঙালী পরাধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ। লেখক বাঙালীর এই পরাধীনতার সময়ে প্রতাপ সিংহের মত একজন স্বদেশী স্বাধীনচেতা বীরের উপাখ্যান পাঠকের নিকট তুলে ধরেন। শত কষ্ট হলেও স্বাধীনতা নামক অমূল্য রত্নটির সুরক্ষা উপন্যাসটির মূল আবেদন। সেসময়ের সচেতন বাঙালী এর থেকে প্রেরণা পাবে না এমন কথা বলা ঠিক হবে না। কেননা, সাহিত্য রসিক সচেতন বাঙালী উপন্যাস পাঠ করে বেদনা অনুভব করতে বাধ্য। উপন্যাসের ট্র্যাজিক পরিণতি পাঠ করে পাঠকের সমকালের পরাধীনতার কথা মনে হবে। অতএব 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'র কাহিনী উনিশ শতকের বাঙালীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে পরোক্ষে জাগিয়ে তোলায় মহৎ প্রেরণা দিয়েছিল — এমন মন্তব্য করা চলে।

একতা ঃ

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করলেই যে তা মিলবে এমন নয়। তার জন্য চাই দৃঢ় সংঘবদ্ধতা। মহারাণা প্রতাপ সিংহকে সহযোগিতা করার জন্য 'চন্দাওয়ৎকুলেশ্বর সালুম্ব্রাধিপতি' দেবগড়ের 'সাঙ্গাওৎকুলেশ্বর', বেদনোরের 'মৈর্ত্ত্যকুলেশ্বরগণ', কৈলওয়ারের 'জগাওয়ৎকুল' এছাড়া 'ঝালাকুল', 'চোহানকুল', 'প্রমরকুল' প্রমুখ রাজপুতবীর ও বীর রাজপুতকুল বিদেশী শত্রু মুঘলের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হন। এই উপন্যাসে একতার আরো পরিচয় পাওয়া যায়, তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহের ব্যক্তিগত শত্রুতা সাময়িকভাবে ভুলে জাতীয় সংকটের মোকাবিলা করা। তেজ সিংহ শত্রু দুর্জ্জয়সিংহকে বরাহের আক্রমণ থেকে প্রাণ রক্ষা করেন। তেজসিংহ বলেন; —"দুর্জ্জয়সিংহের জীবন রক্ষা করা রাজপুতের বিশেষ কর্ত্তব্য, কেননা, তিনি যোদ্ধা, মেওয়ারের এই বিপদকালে

তিনি স্বজাতির উপকার করিতে পারেন।"[৬৯] তেজসিংহ স্নেহ করে প্রাণ রক্ষা করতে যান নি। দুর্জ্জয়সিংহ বীর, তাঁর বীরত্ব প্রতাপসিংহের কাজে আসবে। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, দুর্জ্জয়সিংহ তেজসিংহের শত্রু হলেও জাতিকে বিদেশী শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দুর্জ্জয় সিংহের বীরত্ব বিশেষ প্রয়োজন। তেজসিংহের কাছে ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থ অনেক বড়। 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'য় লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত রাজপুতের সংঘবদ্ধতার পরিচয় দিয়ে সমকালের জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

একনিষ্ঠতা ঃ

স্বাধীনতা রক্ষা বা অর্জনের জন্য চাই নিষ্ঠাশক্তি। প্রতাপসিংহের এবিষয়ে অসম্ভব নিষ্ঠা ছিল। তিনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ধৈর্যের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। এই নিষ্ঠা শক্তির পরিচয় তেজসিংহ, দুর্জ্জয়সিংহ, চারণদেবী, মন্ত্রী ভামাশাহ প্রমুখ চরিত্রের ছিল। রাণা প্রতাপসিংহ যখন সর্বস্বান্ত, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নতুন উদ্যমে যখন যুদ্ধ করা একান্ত জরুরি, ঠিক তখন মন্ত্রী ভামাশাহ তাঁর বংশানুক্রমিক সঞ্চিত ধন স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়;—"মহারাণা! এ দাস প্রভুকে ধন দিতেছে না, মেওয়ার রক্ষার্থ মেওয়ারকে দিতেছে, ...মেওয়ারের জন্য আপনারা শোণিত দিতেছেন, আমি তুচ্ছ ধন দিতে কুণ্ঠিত হইব?[৭০] এ ধরণের মহৎ ত্যাগ বা স্বাধীনতার প্রতি নিষ্ঠতার প্রসঙ্গ সমকালের বাঙালী পাঠককে যে সুগভীর ভাবাবে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

আমরা লক্ষ করব, জাতির সমস্ত প্রকার দুর্বলতা, সংকীর্ণতা প্রভৃতি মোচনের জন্য ভারতীয় দর্শনের অবতারণার ইতিবৃত্ত। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জাতির মুক্তির জন্য ভারতীয় পুরাণ থেকে তত্ত্বের অবতারণা করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল জাতির পরিপূর্ণ উন্নতির জন্য ভারতীয় দর্শন বেশ কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারবে। তাঁর 'আনন্দমঠ' 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'-এ ভারতীয় দর্শন — জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের উপন্যাসরূপ। এবার বাঙালী জীবনে এই উপন্যাস তিনটির দার্শনিক তত্ত্বের ভূমিকা আলোচনা করা হবে ।

'আনন্দমঠ' (১৮৮২) ঃ

'আনন্দমঠ' বাংলা সাহিত্যের একটি বিখ্যাত উপন্যাস। এখানে ১১৭৬-এর মন্বন্তর, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, এদেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মতো কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ'কে ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বীকৃতি দিতে চান নি। তাঁর ভাষায়;—"আনন্দমঠ প্রকাশিত হইলে পর, অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন ঐ গ্রন্থের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না ...ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভান করি নাই।"[৭১] অর্থাৎ লেখকের মন ঐতিহাসিক রস সৃষ্টির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। প্রশ্ন জাগতে পারে, তিনি পাঠকমহলে কি বার্তা পৌঁছোতে চেয়েছিলেন?

দেশমাতৃকা বিপন্না। ভবানন্দ বলেন;—"দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ, আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন তপ্রাণ পর্য্যন্তও যায়।"[৭২] দেশের অরাজকতা দূরীকরণের জন্য 'সন্তানদল' সংগঠিত হয়েছে। উদ্দেশ্য অরাজকতা সৃষ্টিকারী শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। অর্থাৎ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য তাঁদের যাবতীয় উদ্যোগ। আনন্দমঠের 'সন্তানদল' দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের যে মহৎ উদ্যোগ নিয়েছেন, তার জন্য চাই একাগ্রতা। একাগ্রতা বা নিষ্ঠার অভাব 'সন্তানদলে'র সদস্যদের ছিল না। ভবানন্দ বলেন;—"আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"[৭৩] যদি কোন সার্থক আদর্শমন্ত্র পাওয়া না যায় তাহলে এই একাগ্রতা বা নিষ্ঠা কিন্তু দীর্ঘদিন স্থায়ী নাও হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র দেশ সেবার জন্য প্রথমে একাগ্রতার আদর্শ ব্যক্ত করেন। উপন্যাসের সূচনাতেই তিনি 'ভক্তি'র কথা বলেন। এ ভক্তি ঈশ্বরের প্রতি নয়, স্বদেশের প্রতি ভক্তি। দেশমাতৃকার প্রতি এই ভক্তি গভীর তাৎপর্য বহন করে। এদেশের মানুষ ঈশ্বরকে যে স্বার্থগন্ধশূন্য ভক্তি করেন দেশের মুক্তির জন্য চাই প্রথমে সেই জাতীয় ভক্তি। আত্মবিসর্জনের চেয়ে ভক্তির শক্তি অনেক বেশী। প্রাণ বিসর্জন মানে একটা শক্তির ইতি কিন্তু ভক্তির সক্রিয়তার শেষ নেই। 'আনন্দমঠ'-এর 'উপক্রমণিকা'য় প্রাণ ত্যাগ বা আত্মবিসর্জনের চেয়ে ভক্তির জয়গান গাওয়া হয়েছে। দেশসেবার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুটি কি? আনন্দমঠে এ প্রশ্নের উত্তর — 'ভক্তি'।

দেশ সেবার জন্য আর একটি প্রয়োজনীয় আদর্শ হল কর্ম। এ কর্ম সকাম নয়, নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্ম হল নিস্বার্থভাবে কাজ করে যাওয়া, সেখানে ফলের আশা থাকবে না। সব কিছুই ঈশ্বরে সমর্পণ করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ'-এ 'গীতা'র নিষ্কাম তত্ত্বকে আদর্শ হিসাবে প্রচার করেছেন। কেননা — দেশকে মা ভেবে দেশের অনিষ্টকারীকে তাড়াতে হবে। এ কাজ খুব সহজ নয়। এর জন্য চাই — ইন্দ্রিয় দমন, পরিবার পরিজনের প্রতি আসক্তি ত্যাগ প্রভৃতি সমস্ত প্রকার কামনা বাসনা বিসর্জন। এরকম সংকল্পবদ্ধ হলে জাতীয় মুক্তি আসতে বাধ্য। উপন্যাসে শান্তি, কল্যাণী ও মহেন্দ্র এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। অন্যদিকে জীবানন্দ ও ভবানন্দ মাঝপথে ব্যর্থ হলেও প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা নিষ্কামকে অনুসরণ করেছেন। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের দ্বারা সমকালের পাঠককে নিষ্কাম ভাবে দেশসেবার আবেদন জানিয়েছেন।

জাতীয় মুক্তির জন্য জ্ঞান একটি মূল্যবান উপাদান। জ্ঞানের দু'টি অংশ — অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান ও বহির্বিষয়ক জ্ঞান। সমকালে এদেশে একটি বর্তমান ছিল। কিন্তু জাতীয় মুক্তির জন্য চাই অন্তর্বিষয়ক ও বহির্বিষয়ক জ্ঞান। অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান ভারতবর্ষীয় অধ্যাত্ম জ্ঞান ও বহির্বিষয়ক জ্ঞান হল পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের জ্ঞান। জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পাশ্চাত্য জ্ঞান জরুরি। এবং বলা হয়েছে এই জ্ঞান লাভের জন্য এদেশে ইংরেজ রাজত্ব জরুরি। আসলে ইংরেজ রাজা হলে ইংরেজ সংস্পর্শে থেকে ইংরেজের কাছ থেকে বিজ্ঞান শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ তৈরী

হবে। সেজন্যই লেখক বঙ্কিমচন্দ্র এবং উপন্যাসের দেবতুল্য চরিত্র 'মহাপুরুষ' —ইংরেজকে রাজা করার প্রশ্নে সমর্থন করেছেন। এতে স্বদেশ সাময়িকভাবে পরাধীন হলেও জাতীয় মুক্তির জন্য একটি সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক ভাবনা রয়েছে। উপন্যাসে মহাপুরুষ বলেছেন;—'ইংরেজ বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব।"[৭৪] উল্লেখ করা হয়েছে ইংরেজের এই রাজত্বলাভ সাময়িক। তিনি বলেছেন;—'ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতনধর্ম্ম প্রচারের আর বিঘ্ন থাকিবে না।...যত দিন তা না হয়, ...তত দিন ইংরেজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে।"[৭৫] 'আনন্দমঠ' রচনাকালে অনেক বাঙালী তথা ভারতবাসীও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চর্চা ও অন্তর্বিষয়ক জ্ঞানের সাধনা, সনাতন ধর্ম্মের প্রচারে মনোযোগী ছিলেন। অতএব 'আনন্দমঠ' উপন্যাসেই যেন ইংরেজ রাজত্বের সমাপ্তি ঘণ্টা ধ্বনিত হয়েছে — সে দিনের পাঠকের এই বিষয়টি বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় নি।

অতএব 'আনন্দমঠ'-এর আবেদন ঐতিহাসিক রসে সীমাবদ্ধ নয় দেশসেবার আদর্শ প্রচারের ভাবনায় প্রসারিত। লেখকের সে আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়নি। পরাধীন ভারতের মুক্তির জন্য 'আনন্দমঠ' কতখানি ভূমিকা নিয়েছিল, তার সামান্য পরিচয় পাওয়া যাবে 'আনন্দমঠ'-এ 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিটি ভারতের স্বাধীনতা হরণকারী বৃটিশ রাজত্বের শক্ত ভিতকে নাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে।

দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪) ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবীচৌধুরাণী'তে সামাজিক ও ঐতিহাসিক উভয় প্রকার পটভূমি রয়েছে। কিন্তু 'দেবীচৌধুরাণী'কে লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা দিতে চান নি। তাঁর ভাষায়;—"পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক 'আনন্দমঠ'কে বা 'দেবীচৌধুরাণী'কে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বিবেচনা না করিলে বাধিত হইব।"[৭৬] তাহলে বলতেই হয়, উপন্যাসটির পরিকল্পনায় লেখকের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল।

'দেবীচৌধুরাণী'তে অসংখ্য সামাজিক বা পারিবারিক প্রসঙ্গ আছে। প্রফুল্ল সামাজিক বয়কটের কারণে স্বামী সংসার থেকে বর্জিত। আর সেই প্রফুল্ল পরবর্তীকালে দেবী চৌধুরাণী হয়েও স্বামী ও সংসার ত্যাগ করতে পারে নি। উদ্দেশ্যপ্রবণ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক তথা পারিবারিক কথার মধ্যে তাঁর মূল বক্তব্যকে কৌশলে ব্যক্ত করেছিলেন। সংসারত্যাগী নয়, বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন এই সংসারে থেকেও গীতার নিষ্কাম তত্ত্বের অনুশীলন সম্ভব। আসলে তিনি সামাজিক কথার খোলসে ইতিহাসের পটভূমিতে নিষ্কাম তত্ত্বেরই অবতারণা করে পাঠকের জীবনের মান উন্নত করতে সচেষ্ট ছিলেন। উপন্যাসের প্রধান সমস্যা জমিদার ও তার কর্মচারীদের নিষ্ঠুর অত্যাচার দমনের প্রয়াস। ভবানী পাঠকের ভাষায়;—"এ দেশে রাজা নাই। মুসলমান লোপ পাইয়াছে। ইংরেজ সম্প্রতি ঢুকিতেছে—তাহারা রাজ্যশাসন করিতে জানেও না, করেও না। আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের

পালন করি।"[৭৭] একাজ মহৎ ও শ্রদ্ধেয় কিন্তু অত্যাচারীর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা কঠিন কাজ। তাই দেশসেবার পথাদর্শ সাধারণ মানের হতে পারে না। এর জন্য চাই বহু পরীক্ষিত পথাদর্শ। বঙ্কিমচন্দ্র পরীক্ষিত একটি আদর্শ খুঁজে পেয়েছেন ভারতীয় পুরাণ গ্রন্থে। ঈশ্বর সর্বভূতে থাকেন। সর্বভূতে সেবা করাই ধার্মিক ব্যক্তির কাজ। দেশের মানুষও সর্বভূতেরই অন্তর্ভুক্ত । অতএব দেশের সুখ শান্তি হরণকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা অন্যায় নয়। এরকম বীজমন্ত্র নিয়ে দেশসেবায় রত হলে সাফল্য আসবেই। সমকালীন পাঠকের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেমের এই দর্শন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই দর্শন বাঙালী পাঠককে তার কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে সচেতন করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট।

'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসে পতিভক্তি, পিতৃভক্তি, নারীর আদর্শ প্রভৃতি সামাজিক নীতি আদর্শের বিষয়েও আলোকপাত রয়েছে। এই আদর্শ একান্ত ভারতীয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই সব নীতি ও আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আমরা উপন্যাসেই পতিভক্তি, পিতৃভক্তি ও নারীর আদর্শ বিষয়ে নীতি-উপদেশের পরিচয় পাই।

পতিভক্তি ঃ

ভারতীয় দর্শনে স্বামী সুগভীর শ্রদ্ধার পাত্র। তাতে সংসার শান্তির ধাম হয়ে উঠে। এ বিষয়ে প্রফুল্লকে দৃষ্টান্ত করে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বলেন;—

> "ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পুরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃদয় পিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ; স্বামী আরও পরিষ্কার রূপে সান্ত। ...তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ হিন্দুর সমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট।"[৭৮]

তাই প্রফুল্ল দেবীচৌধুরাণী হয়েও পতিকে ভুলতে পারে নি। স্বামী ব্রজেশ্বরকে বলেছে—"তুমি আমার দেবতা। আমি অন্য দেবতার অর্চ্চনা শিখিয়াছিলাম — শিখিতে পারি নাই; তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ — তুমিই একমাত্র আমার দেবতা।" [৭৯] এখানে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় 'পতিপরমগুরু' নামক নীতিকথাকে প্রফুল্লচরিত্রের দ্বারা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

পিতৃভক্তি ঃ

উপন্যাসে পিতৃভক্তির সার্থক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পিতার আদেশে অন্যায় কারী সাহেবের নিকট ক্ষমা চাওয়ার প্রসঙ্গে ব্রজেশ্বর বলে;—"সাহেব, আমরা হিন্দু, পিতার আজ্ঞা আমরা কখনও লঙ্ঘন করি না। আমি আপনার কাছে জোড়হাত করিয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমাকে মাফ করুন।" [৮০] এদেশে পিতার সম্মুখে বলবান যুবক পুত্ররাও সামান্য নাবালক। এই প্রসঙ্গে লেখক বলেন;—"ব্রজ নীরব—বাপের সাক্ষাতে বাইশ

বছরের ছেলে—হীরার ধার হইলেও সে কালে কথা কহিত না—এখন যত বড় মুর্খ ছেলে, তত বড় লম্বা স্পীচ্ ঝাড়ে।"[৮১] প্রথমা স্ত্রী প্রফুল্লের প্রতি অবিচার করেন ব্রজের পিতা। কিন্তু ব্রজ কোনদিনও স্ত্রীর পক্ষ হয়ে পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে নি। আসলে ব্রজ ভারতীয় শাস্ত্রে পিতৃভক্তির বিষয়ে গভীর বিশ্বাসী ছিল। সে জানত;—

পিতাস্বর্গঃ পিতাধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।।"[৮২]

—এ যেন উনিশ শতকের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বিশ্বাসী সন্তানদের প্রতি আত্মশোধনের জন্য আন্তরিক আবেদন।

নারীর কর্তব্য ঃ

সংসারে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টিতে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সংসারে প্রতিটি সদস্যের মুখে হাসি ফোটাতে নারীর তুলনা নেই। সর্বাগ্রে স্বামীকে প্রসন্ন করা নারীর অন্যতম ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন;—

> "গৃহিণী ব্যঞ্জনহস্তে ভোজন—পাত্রের নিকট শোভমানা—ভাতে মাছি নাই—তবু নারী ধর্ম্মের পালনার্থ মাছি তাড়াইতে হইবে। হায়! কোন্ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা এ পরম রমণীয় ধর্ম্ম লোপ করিতেছে? ...হে আকাশ! তাহাদের মাথার জন্য কি তোমার বজ্র নাই?"[৮৩]

কিংবা প্রফুল্লের ঘোমটা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন;—"প্রফুল্লের মুখে একটু ঘোমটা ছিল—সে কালের মেয়েরা এ কালের মেয়েদের মত নহে—ধিক্ এ কাল।"[৮৪] বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় নারীর এসব রীতি নীতি, আদর্শকে ও গুণাবলীকে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনেক নারীপুরুষ এইসব পুরোনো ধ্যান ধারণাকে নিছক গুরুত্বহীন মনে করতেন। সেজন্যই ঔপন্যাসিক আধুনিক নরনারীর প্রতি, আধুনিক কালের প্রতি অনেকটা অসন্তুষ্ট। তাঁর কাছে একালের নারীর সার্থক আদর্শ 'দেবীচৌধুরাণী'র প্রফুল্ল। প্রফুল্ল নিজেকে সংসারে সবার মধ্যে বিলিয়ে দেবার ক্ষমতা নিয়ে বলেছে;—

> "কঠিন ধর্ম্মও এই সংসারধর্ম্ম: ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়। দেখ, কতকগুলি নিরক্ষর, স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কারও কোন কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন ? এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য ?" [৮৫]

লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসের মাধ্যমে বাংলা তথা দেশের ঘরে ঘরে প্রফুল্লের মতো সর্বংসহা নারী কামনা করেছেন, যাতে প্রতিটি গৃহ হয়ে উঠে শান্তির পবিত্র আশ্রম।

'সীতারাম' বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র এ গ্রন্থের উদ্দেশ্যের প্রসঙ্গে বলেছেন;—"সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি । এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা হয় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।"(৮৬) লেখকের প্রত্যক্ষ স্বীকারোক্তি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়;— 'সীতারাম'-এর অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। অনুসন্ধান করলে 'সীতারাম' উপন্যাসে ভারতীয় দর্শন, জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি দরদের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতীয় দর্শনের অবতারণা ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, ভারতীয় দর্শন সমকালের জরাগ্রস্ত জীবনে মুক্তি আনতে পারে। বলা চলে সীতারাম ভারতীয় দর্শনের উপন্যাস রূপ। উপন্যাসটির পরিণতি বিষাদময়। সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যে মহৎ আদর্শ ভারতীয় দর্শনে আছে তাকে সঠিক অনুসরণ না করার ফল উপন্যাসে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়েছে। বলা যায় — উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র কাম, ক্রোধ, অহংকার প্রভৃতির দ্বারা চালিত হওয়ায় উপন্যাসের পরিণতি মর্মান্তিক হয়েছে।

শ্রী, সীতারামের পত্নী। স্বামীর মঙ্গলের জন্য স্বামীর থেকে সে দূরত্ব বজায় রেখেছে। সে গীতার অনাসক্ত ধর্মের আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলেছে। হিন্দুকুলরক্ষক সীতারাম তার প্রতি ক্রমশ আসক্ত হলে সে নিজ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছে। সে স্বামী সীতারামকে বোঝাতে চেয়েছে;— 'ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। ঈশ্বরে প্রীতিই জীবের সুখ বা ধর্ম্ম। তাই সর্ব্বভূতকে ভালবাসিবে। ...তবে যে, কেহ ভালবাসিলে আমরা সুখী হই, সে কেবল মায়ার বিক্ষেপ।"(৮৭) কিংবা "আমি তোমার সহধর্ম্মিনী — আমার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন অধর্ম্মাচরণ করিও না। ধর্ম্মার্থে ভিন্ন যে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি, তাহা অধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পশুবৃত্তি । পশুবৃত্তির জন্য বিবাহের ব্যবস্থা দেবতা করেন নাই । পশুদিগের বিবাহ নাই। কেবল ধর্ম্মার্থেই বিবাহ।"(৮৮) কিন্তু রাজা সীতারাম কোন মতেই বুঝবার পাত্র নন। রাজ্যের সর্বনাশ হতে দেখে জয়ন্তী শ্রী'কে স্ত্রীর কর্তব্য পালন করতে বলেছেন;—"রাজধানীতে যাও। রাজপুরীমধ্যে মহিষী হইয়া বাস কর। সেখানে রাজার প্রধানমন্ত্রী হইয়া তাহাকে সধর্ম্মে রাখ। এ তোমারই কাজ।"(৮৯) শ্রী তার কর্তব্য পালন করতে পারেনি । সে রাজার প্রতি ক্রমশ আসক্ত হয়ে পড়েছিল। তাই শ্রী বলেছে;—"পলায়ণ ভিন্ন ত আর উপায় দেখি না। ..রাজাকে রাত্রিদিন দেখিতে দেখিতে অনেক সময় মনে হয়, আমি গৃহিণী, উহার ধর্ম্মপত্নী।"(৯০) অর্থাৎ শ্রী তার সমস্ত আদর্শ ভুলে সীতারামের সর্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজ্যবাসীর অমঙ্গল সাধন করেছে।

জয়ন্তী সন্ন্যাসিনী। তাঁর সুখদুঃখ ভালমন্দ সবই শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পিত। এককথায় তিনি অনাসক্ত।

মনের গোপনে কোন এক স্থানে এরই জন্য ছিল তাঁর অহংকার। জয়ন্তী নিরহংকার মনে ঈশ্বরকে সবকিছু সমর্পন করতে পারে নি। বঙ্কিমচন্দ্র 'লজ্জা'র প্রসঙ্গে জয়ন্তীর অহংকারকে নিপুণভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। বিবেকদংশনগ্রস্ত জয়ন্তী বলেছেন;—"...মনে করিয়াছিলাম, বুঝি এপৃথিবীর সকল সুখদুঃখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, কিন্তু হে দর্পহারী! আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে, আমায় আজ রক্ষা কর।"(৯১)

অবাঞ্ছিত কাম, ক্রোধ, প্রভৃতিকে পরিহার করার কথা ভারতীয় দর্শনে বলা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি 'সীতারাম' উপন্যাসেও সীতারাম ও গঙ্গারামের ইন্দ্রিয় অসংযমের চিত্র অঙ্কন করে জাতীয় বিপর্যয় দেখিয়েছেন। সীতারাম তাঁর স্ত্রী শ্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে সমস্ত কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পরিণামে সম্ভাবনাময় বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়। গঙ্গারাম রাজার বিশ্বস্ত কর্মচারী। প্রভুপত্নী রমা দেবীর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে, যার পরিণাম — সীতারামের সর্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের সোনালী ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়।

জনমানসের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ঃ উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উপন্যাসে ধরা পড়েছে। 'সীতারাম' উপন্যাসে গঙ্গারামের মৃত্যুদণ্ডের প্রসঙ্গে চন্দ্র চূড়ের মন্ত্রণায় জনমানসের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যার ফল প্রজা, বণিক, নাগরিক সবার স্বপ্নের স্বাধীন 'মহম্মদপুর' নগরের প্রতিষ্ঠা হয়।

স্বদেশের আচর সংস্কৃতির প্রতি দরদ ঃ

'সীতারাম'-এ দেশীয় আচার সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। এদেশে শরণাগতকে রক্ষা করা কর্তব্য কর্ম। বিপদগ্রস্ত গঙ্গারামকে উদ্ধার করতে গিয়ে সীতারাম বলেছে;—"এ আমার ভ্রাতার অপেক্ষা, পুত্রের অপেক্ষাও আত্মীয়; কেন না, আমার শরণাগত। হিন্দু শাস্ত্রের বিধি এই যে, সর্ব্বস্ব দিয়া, প্রাণ দিয়া শরণাগতকে রক্ষা করিবে।"(৯২)

উপন্যাসে ললিত গিরির মতো দেশীয় প্রাচীন ভাস্কর্য শিল্পের সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র গর্বিত। শুধু তাই নয়, এদেশের সম্পদ রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষৎ, বেদ-বেদান্ত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, সাংখ্য, পতঞ্জল, বৈশেষিক, পাণিনি প্রভৃতি কাব্য, দর্শন, নাটক ব্যাকরণ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন;—"হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"(৯৩)

'সীতারাম'-এ ভারতীয় দর্শনের — স্বামী ও স্ত্রী পারস্পরিক কর্তব্য, দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা, ইন্দ্রিয় সংযমতা, ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান প্রভৃতি তত্ত্বকথায় পূর্ণ। উক্ত দেশীয় দর্শন সঠিকভাবে অনুসরণ না করায়

উপন্যাসে বিষাদময় পরিণতির সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক রীতি নীতি সংকীর্ণ হলে সুস্থভাবে বাঁচা অসম্ভব। উনিশ শতকের সামাজিক উপন্যাসে সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের জন্য ঔপন্যাসিক সচেষ্ট ছিলেন। আমরা উনিশ শতকের উপন্যাসে সমাজকে সমৃদ্ধ করার জন্য লেখক তথা ঔপন্যাসিকের ভাবনার অনুসন্ধান করব। এই সময়ে সমাজ বিষয়ক উপন্যাসে সমাজের নানান বিষয়ের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অবতারণা ছিল। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক তাঁর সামাজিক উপন্যাসকে ভালমন্দের নক্সা চিত্রে পরিণত করেছিলেন। মন্দ বিষয় ত্যাগ করে ভাল বিষয়টি গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়ে লেখক দেশীয় সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার পরিচয় দিতেন। এই সময়ের সচেতন বাঙালী সমাজের মঙ্গলের জন্য স্ত্রীশিক্ষাহীনতা, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সমাজের কুসংস্কারকে বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন। সমকালীন ঔপন্যাসিকও সচেতন বাঙালীর প্রগতিশীল উক্ত একাধিক ভাবনার অংশীদার ছিলেন। তাঁদের লেখায় বাঙালী সমাজকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করার জন্য ইন্দ্রিয় সংযমতা অবলম্বন, যৌথ পরিবারের প্রতি সমর্থন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নীতি উপদেশ ছিল। যে নীতি উপদেশ সমকালীন পাঠককে আত্মসচেতন করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল। উনিশ শতকের বিখ্যাত কিছু সামাজিক উপন্যাসের আলোচনা করে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা হবে।

এই শতকের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বিশুদ্ধ সামাজিক উপন্যাসের সংখ্যা খুব কম। আমরা সেজন্যই ক্ষেত্রবিশেষে 'চন্দ্রশেখর'-এর মতো রোমান্সমূলক উপন্যাস বা 'দেবীচৌধুরাণী'র মতো তত্ত্বমূলক উপন্যাসের সামাজিক অংশে সমাজগঠন সম্বন্ধে লেখকের মনোভাবকে প্রকাশ করার চেষ্টা করব।

সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের জন্য চাই উপযুক্ত পরীক্ষিত নীতি আদর্শ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সামাজিক উপন্যাসে পরীক্ষিত নীতি আদর্শের উপস্থাপনা করেছেন।

'বিষবৃক্ষ' সমাজিক নীতি উপদেশমূলক উপন্যাস। আমরা জানি, বিষ জীবননাশক, সতর্কতার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। সমাজেও কিছু ভয়ঙ্কর বিষ আছে, যা জীবনকে অসহ্য যন্ত্রণাময় করে তোলে। লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সে বিষ হল;—

> "যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইতে ফলোৎপত্তি এবং ফলভোগ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে রোপিত আছে। রিপুর প্রাবাল্য ইহার বীজ; ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে

উপ্ত হইয়া থাকে। কেহই এমন মনুষ্য নাই যে, তাঁহার চিত্ত রাগদ্বেষকাম ক্রোধাদির অস্পৃশ্য। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে সেই সকল রিপুকর্ত্তৃক বিচলিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ এই যে, কেহ আপন উচ্ছলিত মনোবৃত্তি সকল সংযত করিতে পারেন এবং সংযত করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি মহাত্মা; কেহ বা আপন চিত্ত সংযত করে না, তাহারই জন্য বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়। চিত্ত সংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি।"[৯৪]

অর্থাৎ কাম-ক্রোধ-লোভ-লালসা প্রভৃতি রিপুকে সংযমের দ্বারা দমন করা উচিত। সংযমতার ক্ষেত্রে কোনরকম আপস করলে জীবন হয়ে উঠে বিষময়। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সংযমতার অভাবে বিভিন্ন চরিত্রের করুণ পরিণতি লক্ষ করা যায়। উপন্যাসের সূচনায় আমরা দেখি নায়ক নগেন্দ্র দাম্পত্য জীবনে সুখী। সে পরহিতৈষী, দয়াবান প্রভৃতি নানা গুণে গুণী। অনাথিনী কুন্দনন্দিনীর সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছে। কুন্দনন্দিনীর বিয়ে দিয়েছে, বিধবা হলে গৃহে ঠাঁইও দিয়েছে। কিন্তু একজন আদর্শ পুরুষের সংযমতার দ্বারা অন্য নারীর সঙ্গে যে দূরত্ব রাখা উচিত ছিল, নগেন্দ্র সে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। কুন্দনন্দিনীকে বলেছে;—

"শুন কুন্দ! আমি বহু কষ্টে এত দিন সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না।...আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি। ইতর হইয়াছি, মদ খাই। আর পারি না। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। শুন, কুন্দ! এখন বিধবা বিবাহ চলিত হইতেছে — আমি তোমাকে বিবাহ করিব।"[৯৫]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের পক্ষে মত দিয়েছিলেন এদেশের অল্পবয়স্ক বিধবা মেয়েদের মানবিক মূল্য প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নগেন্দ্রের কাছে মানবিকতা বড় নয়, বড় হয়ে উঠেছে হাতের কাছে কুন্দনন্দিনীর রূপ যৌবন ভোগাকাঙ্ক্ষা। বিধবা কুন্দনন্দিনীও চিত্ত সংযমের পরীক্ষায় ব্যর্থ। কুন্দের মা নগেন্দ্রের বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল;—"ইহার দেবকান্তরূপ দেখিয়া ভুলিও না।"[৯৬] কিন্তু কুন্দ মায়ের সতর্কতার কথাটি ভুলে নগেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অনুরাগের মুহূর্তে বলেছে;—

"আচ্ছা, নাম মুখে আনিতে পারি না কেন? এখন ত কেহ নাই—কেহ শুনিতে পাবে না। একবার মুখে আনিব? কেহ নাই মনের সাধে নাম করি...আচ্ছা সূর্য্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি আমার সঙ্গে হতো"[৯৭]

বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকদের সুপথে পরিচালিত করার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। চিত্ত সংযমতার অভাবে জীবন অনেক সময় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে। তাই 'রাগদ্বেষ কাম ক্রোধাদি'র সংযম করা উচিত। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে প্রধান ও গৌণ চরিত্রগুলি রিপুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছে। শেষ পর্যন্ত নগেন্দ্র কৃতকর্মের

জন্য বিবেকদংশনগ্রস্ত হয়েছে, কুন্দনন্দিনী বিষপানে আত্মহত্যা করেছে, সূর্য্যমুখী ব্যথাতুর হয়েছে, দেবেন্দ্র কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, হীরাদাসী হয়েছে বিকৃত মস্তিষ্ক। উপন্যাসের শেষে তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন;—"আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।"[৯৮] বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমাপ্তি-বাক্যের সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি চিত্ত সংযমতা বজায় রাখার আন্তরিক পরামর্শমূলক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ', যা পালন করলে স্বদেশের প্রতি ঘরে শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করবে।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)-এর আবেদন 'বিষবৃক্ষ'-এর সমজাতীয়। এখানেও চিত্তসংযমতার অভাবে উন্নত ও আদর্শবাদী চরিত্রের অধঃপতনের চিত্র ফুটে উঠেছে। রোহিনী রূপবতী কিন্তু বিধবা। স্ত্রী ভিন্ন অন্য রূপবতীর প্রতি দূরত্ব রাখা বিবাহিত পুরুষের কর্তব্য। গোবিন্দলাল আদর্শবাদী হয়েও রোহিনীর রূপ যৌবনে ক্রমশ আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। স্ত্রী ভ্রমরের প্রতি কর্তব্য পালনে বিরত হয়ে অসংযমী জীবনকে বেছে নেয়। এদিকে রোহিনীও যৌবনকে বা ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করার জন্য গোবিন্দলালের নিকট ধরা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লোকশিক্ষার জন্য 'কৃষ্ণকান্তের উইল' লিখেছেন, একথা কখনো ভোলেন নি। গোবিন্দলাল ও রোহিনীর অসংযমী ও অরুচিকর জীবনচরিত্রের বিষয়ে বলেন;—"এইখানে যবনিকা পতন করিতে ইচ্ছা হয়। যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব।"[৯৯] লেখক মনে করেন, এই উপন্যাস মানুষের অসংযমী জীবনাচরণের বিরুদ্ধে কথা বলবে। তাই উপন্যাসে কুরুচিকর চিত্র থাকা ঠিক নয়। উপরোক্ত মন্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা সেজন্যই।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের বিষাদময় পরিসমাপ্তি পাঠককে ভারাক্রান্ত করে কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ বঙ্কিমচন্দ্র বিষাদময়তাকে জয় করার রাস্তা দেখিয়েছেন। উপন্যাসে গোবিন্দলাল তার কৃতকর্মের জন্য যখন বিবেকদংশনগ্রস্ত, অপরাধবোধ যখন তাকে হতাশ করেছে, বিষাক্ত মন যখন বাঁচার কোন অর্থ খুঁজে পায় নি, ঠিক তখনই গোবিন্দলালের জন্মান্তর হয়েছে। সে বলেছে;—"ভগবৎ-পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনি আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"[১০০] —গোবিন্দলাল সমস্ত কিছু শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করে 'গীতা'র আদর্শে বাঁচার পথ খুঁজে পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ চিত্ত সংযমের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শেষে নিরাশাগ্রস্ত মানুষের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ঈশ্বরের প্রসঙ্গ এনেছেন।

'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) উপন্যাসের পটভূমি ঐতিহাসিক, কিন্তু সমস্যা সামাজিক। উপন্যাসের মূল কাহিনী চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী ও প্রতাপের প্রণয় সমস্যা। কিন্তু লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের আবেদন ইতিহাসের পটভূমি উপস্থাপন বা চন্দ্রশেখর শৈবলিনী প্রতাপের ত্রিকোন প্রেম সমস্যাই নয়, পাঠককে তিনি চিত্তসংযমতা, পরোপকারিতা ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে রূপোন্মাদনা বা চিত্তচঞ্চলতা কাহিনীকে বিষাদময়তা এনে দিয়েছে। চন্দ্রশেখর বিদ্বান, মাতৃ বিয়োগের পর বিয়ের কথা ভেবেছিল। তার এই বিবাহ করার বাসনা জীবনের প্রয়োজনে নয়, জীবিকার প্রয়োজনে। চন্দ্রশেখরের প্রথম ভুল হয়েছিল এখানেই, কিন্তু প্রধান ভুল হল শৈবলিনীকে দেখে মোহগ্রস্ত হওয়ায়। লেখক চন্দ্রশেখরের মনের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন;—

> "চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, বিবাহ করিলে কোন কোন দিকে সুবিধা হইতে পারে। ...শৈবলিনীকে দেখিয়া সংযমীর ব্রত ভঙ্গ হইল। ভাবিয়া, চিন্তিয়া, কিছু ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন। সৌন্দর্য্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয়?"(১০১)

এখান থেকেই কাহিনীর জটিলতার সূত্রপাত। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর মানবিক অনুভূতিকে তৃপ্তি দিতে পারে নি। সেজন্য শৈবলিনী বাল্যপ্রেমিক প্রতাপকে সরিয়ে স্বামী চন্দ্রশেখরকে মন দিতে পারে নি। শৈবলিনী প্রতাপের মধ্যে পৌরুষত্বের যে উদ্দামতার আঁচ পেয়েছে চন্দ্রশেখরের নিকট তা খুঁজে পায় নি। শৈবলিনী প্রতাপকে বলেছে;—"তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল?"(১০২) শৈবলিনীর চিত্ত চাঞ্চল্য তার জীবনকে বিষাদময় করে তুলেছে। পাশাপাশি প্রতাপ চরিত্রের আত্মসংযমী ও পরোপকারী মনোভাব লক্ষ করার মতো। চন্দ্রশেখরের সুখের জন্য প্রতাপ নিজ জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছে। কেননা, চন্দ্রশেখরের জন্যই প্রতাপের যা কিছু উন্নতি। শৈবলিনীকে নাগালের মধ্যে পেয়েও প্রতাপ আত্মসংযমীর পরিচয় দিয়েছে। সেজন্য উপন্যাসের শেষে রমানন্দস্বামী প্রতাপ সম্বন্ধে বলেছেন;—

> "ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই। যদি চিত্তসংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী। প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী হই।"(১০৩)

এখানে ইন্দ্রিয়জয়, চিত্তসংযম ও পরোপকারের মাহাত্ম্যগীত গেয়ে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র বলার চেষ্টা করেন যে, উক্ত গুণাবলী একজন আদর্শ পুরুষের নিকট খুবই জরুরি। যার ফলে সমাজ ও দেশ উপকৃত হয়।

আমাদের জীবন অনেক সময় নানা সমস্যায় অনন্ত দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসে তা থেকে মুক্তির উপায় বলে দিয়েছেন। রমানন্দস্বামী ভারতীয় দর্শনের গূঢ় তত্ত্বকথাকে প্রকাশ করেন এইভাবে;—"সুখ দুঃখতুল্য বা বিজ্ঞের কাছে একই।"(১০৪) ভারতীয় দর্শনে সুখ ও দুঃখকে আলাদা করা হয় নি। কর্মযোগী, আত্মসংযমী, পরোপকারী ব্যক্তি যদি সুখ দুঃখের গণ্ডীতে আবদ্ধ হয় তাহলে তাঁদের নিঃস্বার্থ কর্ম আর বেশীদূর অগ্রসর হবে না। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র, রমানন্দস্বামীর মুখ দিয়ে ভারতীয় দর্শনের একটি দিক উদ্‌ঘাটন করিয়েছেন।

দর্শনটি হল;—"যেই পরোপকারী, সেই সুখী, অন্য কেহ সুখী নহে।"[১০৫] সুখের শীর্ষ চূড়া স্পর্শ করতে হলে পরোপকারী হতে হবে। তাতে এক অপার্থিব আনন্দ আছে। এই অপার্থিব আনন্দ আস্বাদনই সুখ। এই সুখে যিনি সুখী হচ্ছেন তার যেমন আনন্দ আছে তেমনি যার উপকার হচ্ছে তারও আনন্দ। এজাতীয় সুখে সুখী হবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দশেখর' উপন্যাসে পাঠককে আবেদন জানিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' (১৮৭৭) শিল্প ও নৈতিকতায় সমৃদ্ধ উপন্যাস। এই উপন্যাসে লেখক শিল্পকে তার নিজস্ব পথে চলতে দিয়েও লোকশিক্ষাকে বা নৈতিকতাকে ভোলেন নি। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ধারায় 'রজনী'তেই প্রথম চরিত্রের আত্মকথা প্রকাশের ভঙ্গি দেখা যায়। এতে উপন্যাস সাহিত্যে বৈচিত্র্য এসেছে। উপন্যাসটির মূল সমস্যা প্রণয়ঘটিত। অন্ধ যুবতী রজনীর অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনে প্রেমের সঞ্চার হওয়া উপন্যাসটিকে আকর্ষণীয় করেছে। রজনী ছাড়াও শচীন্দ্র, অমরনাথ ও লবঙ্গলতার জীবন সমস্যা, প্রণয় ঘটিত সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ভাব উপন্যাসটির আস্বাদ বাড়িয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এতসব আয়োজন করেও লোকশিক্ষাকে গুরুত্ব সহকারে প্রয়োগ করেছেন। লেখক মনে করেন অসংযমতা বা অশ্লীলতা সুস্থ সমাজজীবনে বা পারিবারিক জীবনের পক্ষে অন্তরায়। অমরনাথ প্রথম জীবনে যৌবনের চঞ্চলতায় রূপবতী লবঙ্গলতার ঘরে প্রবেশ করেছিল। অমরনাথের এই একমাত্র ভুলই সারাজীবন তাকে দগ্ধ করেছে। সুস্বাস্থ্য, বয়স, বিদ্যা, ধনসম্পদ থাকা সত্বেও এই একমাত্র ভুলই সারাটা জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র যেন অমরনাথ চরিত্র অঙ্কন করে পাঠক সাধারণকে এরকম ভুল না করার জন্য সচেতন করেন। অমরনাথের ভাষায়;—"এ সংসারসাগরে, কোন্ চরে লাগিয়া আমার এই নৌকা ভাঙ্গিয়াছে, তাহা এই বিশ্বচিত্রে আমি আঁকিয়া রাখিব; দেখিয়া নবীন নাবিকেরা সতর্ক হইতে পারিবে।"[১০৬] অমরনাথের সব সর্বনাশের মূল যে লবঙ্গলতার কক্ষে প্রবেশের কলঙ্ক, তা অমরনাথ নিজেই বলেছে। অমরনাথের আবেদন এবং স্বীকৃতি পাঠককে নীতিবাদী করার জন্য — এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

লবঙ্গলতা বৃদ্ধ রসময় মিত্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। লবঙ্গলতা সংযমতা নিয়ে বৃদ্ধ স্বামীর ঘর করছে। অথচ অমরনাথের মতো সুপুরুষ একদিন তার নাগালের মধ্যে ছিল, কিন্তু সামাজিক নিয়মে আজ সে পরপুরুষ। সেজন্য হৃদয়ের কোন এক গোপনতম জায়গায় অমরনাথ বিরাজ করে। সামাজিক নৈতিকতাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অমরনাথ লবঙ্গলতার প্রেম পায় নি। লবঙ্গলতা অমরনাথকে বলেছে;—"তুমি আমার কে ? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে"[১০৭] লবঙ্গলতা এ জন্মে অমরনাথকে ভালোবাসতে পারে নি। কেননা, অমরনাথ পরপুরুষ। সংযমী মন নিয়ে লবঙ্গলতা অমরনাথের থেকে দূরত্ব তৈরী করেছে। সংযমতার কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লবঙ্গলতা বলে — যে আমার স্বামী না হয়ে আমাকে কামনা করেছিল, সে মহাদেব হলেও আমার হৃদয়ে তার স্থান নেই। কেননা, লবঙ্গলতা ধর্মকে

বড় মনে করে। অমরনাথকে লবঙ্গলতা বলেছে;— "তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।"(১০৮) লবঙ্গলতা ভারতীয় সমাজের পবিত্র ধর্মকে রক্ষা করার জন্য সংযমতার আশ্রয় নিয়েছে। ইন্দ্রিয় সুখ নয়, ইন্দ্রিয়কে সংযম করার বৃহৎ ও মহৎ আদর্শ, যা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তির পথকে প্রশস্ত করে। লবঙ্গলতার চরিত্র ত্যাগের এক মহৎ আদর্শ, যা বেদনাবহ হলেও শ্রদ্ধাস্পদ।

লেখক বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবান ছিলেন। অন্ধ রজনীর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার মত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তা প্রকাশ পেয়েছে। বিষয়টি অলৌকিক, লেখক প্রকাশ্যে অলৌকিকতার দায় না নিলেও নীরব সমর্থন দেওয়া থেকে পিছিয়ে যান নি। আধুনিক শিক্ষিত শচীন্দ্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন;— "আমাদিগের ভারতবর্ষে চিকিৎসা সম্বন্ধে কতকগুলি অতি আশ্চর্য্য প্রকরণ ছিল—সে সকল তত্ত্ব ইউরোপীয়েরা বহুকাল পরিশ্রম করিলেও আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। চিকিৎসাবিদ্যায় কেন, সকল বিদ্যাতেই এইরূপ।"(১০৯)

বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'চন্দ্রশেখর' ও 'রজনী' উপন্যাসগুলি আলোচনা করে দেখা গেল লেখক অসংযমী, চিত্তচাঞ্চল্য প্রভৃতি রিপুগুলিকে দমন করার পরামর্শ দিয়েছেন। উপন্যাসের যে চরিত্রগুলি সংযমী, তারা লেখকের সমর্থন পেয়েছে। তাই তাঁর সামাজিক বা সমাজ সম্পর্কিত উপন্যাসে চরিত্রগঠন বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে অর্ধেক নারী ও অর্ধেক পুরুষ। অতএব নারী পুরুষের যৌথ চরিত্রগঠন বা চরিত্রগঠন বিষয়ে নীতিশিক্ষা তাঁর উপন্যাসে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, চরিত্রবান নারী-পুরুষ দেশের পক্ষে সম্পদ বিশেষ।

বঙ্কিমচন্দ্র নারী চরিত্রের মহৎ গুণাবলীকে শ্রদ্ধা করতেন। যে গুণাবলী পরিবার, সমাজ ও স্বদেশ গঠনে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। তিনি 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর 'স্ত্রীলোকের রূপ'-এ মেয়েদের রূপচর্চার সমালোচনা করেন। তাঁর মতে;—

> "রূপ রূপ করিয়া স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।...ইহাতেই মনুষ্য সমাজের কলঙ্ক বারাঙ্গনাবর্গের সৃষ্টি। ইহাতেই পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকের দাসীত্ব।...আমি শুনিতে চাই যে, নারীজাতির রূপাপেক্ষা শত গুণে, সহস্র গুণে, লক্ষ গুণে, কোটি গুণে মহত্বের গুণ আছে। আমি শুনিতে চাই যে, তাঁহারা মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি।"(১১০)

তিনি রূপ চর্চার পরিবর্তে নারী চরিত্রের মহৎ গুণাবলীর বিকাশের উপরই জোর দিয়েছেন। মেয়েরা রূপচর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে সমাজ সমৃদ্ধ হবে না। নারী পরিণত হবে ভোগের বস্তুতে। তার পরিচয় হবে দাসী কিংবা বারাঙ্গনা, যা সমাজের পক্ষে কলঙ্ক। অতএব লেখক নারীকে তার মহৎ গুণাবলী বিকাশের পরামর্শ দিয়েছেন। 'রজনী' উপন্যাসের লবঙ্গলতা চরিত্রে নারীর মহৎ গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। লবঙ্গলতা তার বৃদ্ধস্বামীকে

ভালবাসে, যা তার চরিত্রের সহিষ্ণুতার কথা মনে করিয়ে দেয়। অমরনাথ লবঙ্গলতার হৃদয়ে একটু জায়গা পেতে চেয়েছিল, কিন্তু পায় নি। লবঙ্গলতা বৃদ্ধ স্বামীকেই ভালবাসে, বৃদ্ধ স্বামীকেই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। এটাই ভারতীয় নারীর ধর্ম। এ বিষয়ে লেখকের সার্থক চরিত্র 'দেবীচৌধুরাণী'র প্রফুল্ল। প্রফুল্ল যশ, মান, সম্পদ, রাজত্ব ও যাবতীয় সুখ-ঐশ্বর্য উপেক্ষা করে সাধারণ গৃহিণী হতে চেয়েছে। প্রফুল্ল বলেছে;—

> "এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসারধর্ম্ম; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়। দেখ, কতক গুলি নিরক্ষর স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কারও কোন কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়; সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে।"(১১১)

পুরুষ চরিত্রের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত চিত্ত চাঞ্চল্য দূর করে পরোপকারী হওয়ার উপরেই গুরুত্ব দিয়েছেন। এবিষয়ে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ সমর্থন পাওয়া যায়। 'একা "কে গায় ওই"' নামক প্রথম সংখ্যায় বলা হয়েছে— "পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।"(১১২) এই গ্রন্থেরই 'আমার মন' নামক 'পঞ্চম সংখ্যা'য় আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে;— "আমি চিরকাল আপনার রহিলাম— পরের হইলাম না, এই জন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই।"(১১৩) পুরুষ চরিত্রের পরহিতৈষী আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে খুবই শ্রদ্ধেয়। এই আদর্শের ঔপন্যাসিক চরিত্র 'কপালকুণ্ডলা'র নবকুমার বা 'চন্দ্রশেখর'-এর প্রতাপ। নবকুমার সহযাত্রীর অনাহারের দুঃখে কাতর হয়ে, সহযাত্রীর মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। আবার প্রতাপ আত্মবিসর্জন দিয়ে চন্দ্রশেখর ও শৈবালিনীর জীবনে সুখ আনতে চেয়েছিল। বঙ্কিম সাহিত্যের এইসব চরিত্রগুলি পাঠকের শ্রদ্ধা অর্জন করে।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য ভাবধারা মানুষকে যখন ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক ও ভোগবাদী করে তুলেছিল তখন বঙ্কিম সাহিত্যের লবঙ্গলতা, প্রফুল্ল, প্রতাপ বা নবকুমারের মত নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলি আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাদী ভাবনার বিপক্ষে কথা বলে।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা হিসাবে পরিচিত। এবিষয়ে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'য় বলেন;— "অবিমিশ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের নিদর্শন বঙ্গসাহিত্যে এক রমেশচন্দ্রের উপন্যাসেই পাওয়া যায়।"(১১৪) তিনি 'সংসার কথা' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৪) নামে দু'খানি সামাজিক উপন্যাসও লেখেন। এই দু'খানি উপন্যাসে রমেশচন্দ্র দত্ত সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। এতে লেখকের প্রগতিশীল মনোভাব স্পষ্ট। আমরা জানি, অষ্টাদশ শতক এমনকি

লেখকের সমকালেও সামাজিক কুসংস্কার ব্যক্তি ও সমাজকে অবক্ষয়ের গভীর খাদে নিক্ষেপ করেছিল। কেননা, সামাজিক কুসংস্কার ব্যক্তির মানবিক অধিকারের পরিপন্থী। তাই সচেতন ব্যক্তি মাত্রই সামাজিক এই ব্যাধির বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন। রমেশচন্দ্র দত্ত একজন সচেতন ব্যক্তি। তিনি তাঁর সামাজিক উপন্যাসে সমাজের মঙ্গলের জন্য সামাজিক কুসংস্কারকে ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

'সংসার-কথা' উপন্যাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা বিবাহের মতো প্রগতিশীল ভাবনার পরিচয় আছে। শরৎ শিক্ষিত ও সচেতন যুবক, সে মনে করত কুসংস্কারকে বর্জন করা খুব জরুরি। নইলে সমাজের উন্নয়ন অসম্ভব। শরৎ বলেছে;—"...এইরূপ সমাজ হইয়াছে বলিয়াই সংস্কার অবশ্যম্ভাবী, সমাজের ন্যায়-অন্যায়ের বিচার না থাকিলে সে সমাজও থাকে না।"[১১৫] শরৎ নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছে, বিধবা বিবাহে কোন পাপ বা অন্যায় নেই। সেজন্য সে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছে;— "...আমি যে কার্য্যটী করিয়াছি তাহা পাপ বলিয়া মনে করি না,"[১১৬] উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি, শরৎ-সুধার নতুন দাম্পত্য জীবন সুখে শান্তিতে পরিপূর্ণ। সুধা একসময় বিধবা ছিল বলে তার নতুন দাম্পত্য জীবনে সুখ ও শান্তির অভাব হয় নি। এবিষয়ে শরৎচন্দ্র কোনরকম অভিযোগ আনে নি। লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত 'সংসার কথা' উপন্যাসে বিধবার বিয়ের দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, বিধবার বিয়ের মধ্যে অন্যায় বা পাপ বলে কিছু নেই। বরং সমকালীন সমাজ যদি বাল্য বিধবার বিয়ের ব্যবস্থা করে তাহলে নারীর মানবিক অধিকারই প্রতিষ্ঠা পাবে।

'সমাজ' উপন্যাসেও লেখক রমেশচন্দ্র দত্তের সমাজ সংস্কারের মনোভাব স্পষ্ট। এই উপন্যাসে জাতপাত বা বর্ণ বৈষম্যকে অবাঞ্ছিত এবং কুসংস্কার হিসাবে দেখান হয়েছে। রমণীকান্ত উপলব্ধি করেছেন, সমাজে বর্ণ বৈষম্য থাকলে প্রকারান্তরে সমাজেরই ক্ষতি হয় । তিনি বর্ণ বৈষম্যহীন এক সমাজের কথা কল্পনা করে আনন্দিত। হেমচন্দ্রকে অগণিত সাধারণ নরনারী দেখিয়ে বলেন;—

> "হেমচন্দ্র! ইহারা আমার আত্মীয় বান্ধব। তুমি আমি যেমন হিন্দু, ইহারাও সেইরূপ হিন্দু, ইহারা আমাদের এক ধর্ম্মাবলম্বী, এক হিন্দুজাতীয়। পুরাকালে সকল হিন্দুদিগের মধ্যে আহার-ব্যবহার ছিল, কি ছার আধুনিক নিয়মে আমরা বিভিন্ন হইয়া জাতীয় দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছি! আমাদের মধ্যে অনৈক্য সাধন করা, দুর্ব্বলতা সঞ্চার করা অনেকের অভিপ্রায়, আমরা নিজের চেষ্টায় যদি ঐক্য সাধন করিতে পারি, তবে হিন্দুজাতির গৌরবের কি আর সীমা থাকিবে?"[১১৭]

রমণীকান্ত উদার মন নিয়ে ভেবে দেখেছেন — দেশের 'পণ্ডিতাভিমানী শাস্ত্রজ্ঞগণ' মানুষকে প্রকৃত শাস্ত্রীয় শিক্ষা দেন না। তিনি জাহাজে চড়া, বর্ণনির্বিশেষে বিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জন ও আহার বিহার, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রদ,

স্ত্রীশিক্ষা ও বাল্যবিধবার বিবাহ প্রভৃতি প্রগতিশীল রীতি আচারের প্রবর্তনকে সমর্থন করেন। সেজন্যই রমণীকান্ত ব্রাহ্মণ হয়েও পুত্র দেবীপ্রসাদের সঙ্গে কায়স্থ বংশের কন্যা সুশীলার অসবর্ণ বিয়ের উদ্যোগী হন। রমেশচন্দ্র দত্ত সমাজের প্রগতিশীল বিষয়গুলিকে উপন্যাসে প্রচার করে পাঠককে সংকীর্ণতামুক্ত করার একটি গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন।

উনিশ শতকের একজন বিখ্যাত সামাজিক ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১)। তিনি খাঁটি সামাজিক উপন্যাস রচনা করার জন্য কলম ধরেন। এখানে তাঁর সার্থক উপন্যাস তথা বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'র (১৮৭৪) আলোচনা করা হবে। 'স্বর্ণলতা'র লেখক নীতিবোধকে অস্বীকার করেন নি। বরং বলা যায় যৌথ পরিবার, ন্যায় ও সদাচার এবং ধর্মের জয়গানমূলক উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'। সমাজে ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার মানুষ থাকে। কেউ পরোপকারী আবার কেউ বা চরম স্বার্থপর। প্রমদা, গুরু শশাঙ্ক প্রমুখ খল চরিত্র। প্রমদা স্বামী শশিভূষণ ও দেবর বিধুভূষণের যৌথ পরিবার ভেঙ্গে দিয়েছে। ছোট জা সরলার উপর অমানুষিক নির্যাতন করেছে। গুরুশশাঙ্ক অনেক অর্থের বিনিময়ে অভিভাবকহীনা স্বর্ণলতার জোর করে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। পাশাপাশি সরলা, গোপাল ও স্বর্ণলতার দাদা প্রমুখ চরিত্রে সহিষ্ণুতা ও পরোপকারী মনোভাব ফুটে উঠেছে। সরলা, বড় জা প্রমদার অপমান মুখ বুজে সহ্য করেছে। স্বর্ণলতার দাদা দরিদ্র গোপালকে বন্ধু ভেবেছে ও গোপালের পড়াশুনার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে গোপালের সহজ, সরল, নির্লোভ ও দায়িত্বপরায়ণ চরিত্র আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে। উপন্যাসের ভাল ও মন্দ চরিত্রগুলি সম্বন্ধে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন;—

> "যখন উপন্যাসটির উপসংহার হইল তখন দেখা গেল যে, সকল অপরাধীর দণ্ড হইয়াছে ও সকল সাধুপুরুষ সাংসারিক সচ্ছলতা ও মানসিক শান্তি লাভ করিয়াছে। উপন্যাসখানি শেষ করিয়া আমাদের যে মনোভাব হয়, তাহা রূপকথা-পাঠের পর শিশুসুলভ তৃপ্তির সহিত তুলনীয়।"(১১৮)

অর্থাৎ উপন্যাসটি অতি নীতিকথার উপর প্রতিষ্ঠিত। লেখক এখানে বিতর্কিত সামাজিক সমস্যাকে উপন্যাসের কাহিনী করেন নি।

অতএব বলা যায় — উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিক সামাজিক বিষয়কে নিয়ে উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে সমকালীন সমাজকে সুপথে চালিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি-উপদেশ দিয়েছেন। যে নীতি উপদেশগুলি সামাজিক মানুষের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধ জীবন লাভের পরীক্ষিত পথাদর্শ।

এবারে কথাসাহিত্যের অন্য আর একটি শাখা ছোটগল্পের আলোচনা করা হবে। ছোটগল্প সম্বন্ধে প্রচলিত 'Peculiar Product in nineteenth century' নামক বিশেষ মতটিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমর্থন করতেন। তাঁর ভাষায়;—

> "এ উনিশ শতকের এক সম্পূর্ণ নিজস্ব সামগ্রী — যা ইতঃপূর্বে —অন্তত এই রূপে — বিদ্যমান ছিল না। এ নভেলও নয়, রোমান্সও নয়, এ কবিতার মতো ঐক্যভাবাশ্রয়ী — অথচ কল্পনামুখ্য নয়, জীবন-নির্ভর। আবার সেই জীবনের সমগ্রিকতার প্রতিচ্ছবিও এতে নেই—এতে খণ্ডতার ব্যবহার। সুতরাং এ বস্তু স্পষ্টই 'অভিনব'— এ হল একটি Peculiar Product।"(১১৯)

আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের ভাষার মত বাংলা ভাষায়ও উনিশ শতকেই ছোটগল্পের সূচনা হয়। বাংলা ভাষায় উনিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের হাতেই ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত— 'দেনাপাওনা', 'পোষ্টমাষ্টার', 'গিন্নি', 'রামাকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান' ও 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' গল্পই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প। এবিষয়ে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কালের পুত্তলিকা' গ্রন্থে লিখেছেন;—

> "উদ্দেশ্য সচেতন শিল্পবুদ্ধি, অভিনব সাহিত্য বাহনের উপর নিশ্চিত অধিকার ও তার ব্যবহার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রথম দেখা গেল হিতবাদীর যুগে (১৮৯১ খ্রীঃ)। এ কারণে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দটিকে রবীন্দ্রগল্প তথা বাংলা ছোটগল্পের সূচনা মুহূর্ত রূপে ধরাই সঙ্গত।"(১২০)

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দকে বাংলা ছোটগল্পের সার্থক সূচনাকাল ধরা হলেও উনিশ শতকে রবীন্দ্র সমসাময়িক কালে বা তার পূর্বে বাংলা ছোটগল্পের একটি পূর্বাভাষ পর্ব ছিল। অর্থাৎ এই শতকে বাংলা ছোটগল্পের সূচনার একটি পূর্বাভাষ লক্ষ করা যায়। এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখের নাম করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র কোন ছোটগল্প লেখেন নি বা সচেতনভাবে লেখার চেষ্টাও করেন নি। আমরা তবুও তাঁর কয়েকটি রচনায় গল্পের পূর্বাভাষ লক্ষ করেছি। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার দ্বারা বাংলা কথাসাহিত্যের দ্বার উন্মোচন করেন। ছোটগল্প কথাসাহিত্যের একটি শাখা, যা ঠিক উপন্যাসের পরে আবির্ভূত। 'ইন্দিরা' (১৯৭৩), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪) ও 'রাধারাণী' (১৮৮৬) উপন্যাস হলেও আকৃতিতে অনেকটা ছোট। এগুলি উপন্যাস হলেও অন্তত আকৃতির দিক থেকে বাঙালী পাঠক ছোটগল্পের আস্বাদ পায়। অনেকে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী'কে ছোটগল্প বলতে চেয়েছেন। এবিষয়ে ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন;—

"প্রথম সার্থকনামা বাংলা ছোটগল্পও আবির্ভূত হয়েছিল 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠাতেই। গল্পটির নাম 'মধুমতী', প্রকাশ কাল ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস ['বঙ্গদর্শন', ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা]। গল্পের নীচে লেখকের নাম লিখিত আছে শ্রীপূঃ-ইনি ছিলেন বঙ্কিম-সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'মধুমতী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থকনামা ছোটগল্প, কিন্তু তা স্রষ্টার অবচেতন মনের রচনা।"(১২১)

অর্থাৎ ভূদেব চৌধুরী বাংলা ছোটগল্পের প্রথম লেখকের বিরল সম্মান পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তবুও বঙ্কিমচন্দ্র বা পূর্ণচন্দ্র বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যের অবিস্মরণীয় শিল্পী নন। পরবর্তীকালে অনেক গল্প লেখা হলেও উনিশ শতকেই গল্প লিখে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্বর্ণকুমারী দেবী যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যেহেতু এই দু'জন বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যের প্রথম দিকের অবিস্মরণীয় শিল্পী, সেজন্য উনিশ শতকে রচিত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ ও স্বর্ণকুমারীদেবীর গল্প আলোচনা করা হবে।

প্রথমে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্পের পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ছোটগল্প লেখেননি, তিনি গল্প লিখেছেন। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন;—

"ত্রৈলোক্যনাথের চারটি গল্প-সংকলনই গল্পমালা। গল্পের মধ্যে গল্প, অথবা এক গল্পের টানে অপরাপর গল্প। ত্রৈলোক্যনাথ গল্প রচনায় কোনো আধুনিক আদর্শ অনুসরণ করেন নি।...উদ্ভট, আজগবি, অলৌকিক ও রূপকথা-উপাদানে পরিপূর্ণ তাঁর গল্প। অথচ তা একেবারে বাস্তব বর্জিত নয়। ত্রৈলোক্যনাথের মানবতাবাদের — যুক্তিধর্মিতা, পরার্থপরতা, দেশহিতৈষিতা ও মানবমুখিতার পরিচয় তাঁর গল্পে ছড়ানো আছে। সমাজ সংস্কারকের সচেতনতা ও মানবপ্রেমিকের সীমাহীন দরদ তাঁর গল্পে উপস্থিত।"(১২২)

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় স্বীকার করেন ত্রৈলোক্যনাথ আজগবি, অলৌকিক ও রূপকথাধর্মী গল্প লিখলেও তাঁর লেখায় মানবতা, পরার্থপরতা ও দেশহিতৈষণা প্রভৃতি গুণ সমৃদ্ধ। ডঃ সুকুমার সেনও ত্রৈলোক্যনাথের কর্মনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের কথা স্বীকার করেন। এবিষয়ে তাঁর উদ্ধার করা তথ্য এইরকম —

"ত্রৈলোক্যবাবু স্বাবলম্বনপ্রিয়, স্বাধীনচেতা, অধ্যবসায়শীল এবং উদ্যোগী পুরুষ।...অতি সামান্য অবস্থা হইতে ইনি আত্মোন্নতি এবং দেশের উন্নতি করিয়া ধন্য হইয়াছেন, ...আর আহ্লাদের কথা, —এত কাজের ভিড়েও ত্রৈলোক্যবাবু স্বজাতীয় সাহিত্য সেবায় বিরত নহে।"(১২৩)

এখানে ব্যক্তি ত্রৈলোক্যনাথের কর্মজীবনে নিষ্ঠার কথা জানা গেল। ভূদেব চৌধুরী ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য চর্চার আলোচনায় প্রমথনাথ বিশীর রচনার উল্লেখ করেন —

"ত্রৈলোক্যনাথ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন আমৃত্যু দেশের দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণের পরে পূর্বতন ভাবে প্রতিজ্ঞা রক্ষার উপায় ছিল না, তখন প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত তিনি সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করিলেন।"(১২৪)

অতএব আমরা প্রত্যাশা করতে পারি, লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচিত গল্পে স্বদেশের মানুষের চেতনা বিকাশের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

উনিশ শতকে রচিত ত্রৈলোক্যনাথের গল্প গ্রন্থ 'ভূত ও মানুষ' (১৮৯৭)। গল্পগুলি আজগবি, অলৌকিক ও রূপকথাধর্মী মনে হবে। কিন্তু গল্পের অন্তরালে লোকশিক্ষা, নৈতিকতা প্রভৃতি ইতিবাচক গুণাবলী লক্ষ করা যায়।

'ভূত ও মানুষ' গল্প গ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'বীরবালা' (১৮৯৩)। গল্পের প্রথমেই লেখক বলেন;— "পাঠক, গল্পটি বুঝিয়া পড়িবেন।" গল্পের সূচনাতেই লেখক ত্রৈলোক্যনাথ পাঠকের মনে একটি কৌতূহল সৃষ্টি করেছেন। আবার গল্পের শেষে লেখক বলেন;— "এই বীরবালার গল্পটি যাঁহারা মনযোগ দিয়া পাঠ করেন, চিরদিন তাঁহাদের ঘরে পৌষপার্বণের আনন্দ বিরাজ করে, তাঁহাদের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়।"(১২৫) আমরা 'বীরবালা' গল্পের সূচনা বাক্য ও সমাপ্তি বাক্য দু'টি একটু বিশ্লেষণ করলে দেখব, লেখক ত্রৈলোক্যনাথ কেবল রূপকথার গল্পের জন্যই এরকম মন্তব্য করেন নি। গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র বীরবালা। দেবীসিংহ স্বপ্নে দেখে বীরবালা নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বামীর মঙ্গল কামনায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অসাধ্য সাধন ঘটিয়ে বীরবালা স্বামীকে মুক্ত করে ও স্বামীর সংসার শান্তিতে ভরে দেয়। বীরবালার রূপে ও গুণে সকলেই মুগ্ধ। লেখকের ভাষায়;—

"বীরবালার রূপে, বীরবালার গুণে, দেবীসিংহের পিতামহী ও আত্মীয়-স্বজন প্রতিবাসীগণ মুগ্ধ হইলেন। পৌষপার্বণের সময় গৃহে কুটুম্বেরা সমাগত হইয়াছেন। পিতামহী কত চাউল কুটিলেন, কত ডাউল বাটিলেন, কত নারিকেল কুরিলেন। নানাবিধ পিষ্টক করিয়া কুটুম্বদিগকে আহার করিতে দিলেন। এই বীরবালার গল্পটি যাঁহারা মনযোগ দিয়া পাঠ করেন, চিরদিন তাঁহাদের ঘরে পৌষপার্বণের আনন্দ বিরাজ করে, তাঁহাদের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়।"(১২৬)

গল্পটি রূপক ধর্মী। দেবীসিংহের গৃহে বীরবালার মতো স্ত্রীর আগমনে আনন্দ উৎসবের সূচনা হয়েছে। এরকম আনন্দ উৎসব বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে সম্ভব, যদি বীরবালার মত গুণবতীর আবির্ভাব হয়। লেখক কামনা করেছেন, যাঁরা 'বীরবালা' মনযোগ দিয়ে পাঠ করবেন, তাঁদের ঘরে পৌষপার্বণের আনন্দ বিরাজ করবে। আসলে গল্পটি মন দিয়ে পড়লে বীরবালার গুণে পাঠককে আকৃষ্ট হতে হয়। চরিত্রটি সম্বন্ধে বাঙালী পাঠকের

এরকম আকর্ষণ সৃষ্টি হলে বাংলায়ও বীরবালার মতো গুণবতী নারীর আবির্ভাব সম্ভব হবে। আর তাহলে শুধু রাজস্থানের দেবীসিংহের পরিবারে নয়, বাংলার ঘরে ঘরে শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করবে।

'বীরবালা' গল্পে পাঠকের নীতিবোধ ও মানবিকতার বিকাশের জন্য ব্যঙ্গ লক্ষ করা যায়। ধর্মদত্ত প্রসঙ্গে অমাবস্যা বাবাজী বলে;—"ধর্মদত্ত! দিন দিন তুই অতি মূর্খ ও অতি নির্বোধ হইতেছিস! শাস্ত্রে আছে,—

> "চাচা, আপনা বাঁচা।" —তাই প্রতিবাসী গৃহে ডাকাত পড়িলে সেকালের লোকে আপনার ঘরে দোহারা তেহারা খিল ও হুরকো দিয়া বসিয়া থাকিত, কেহ বাহির হইত না। আজকালের ছেলেরা সব হইল কি? পরের জন্য প্রাণসমর্পণ। পাঁচ বছরের একটা মেয়ে বাঁচাইতে জলে ঝাঁপ! এ সকলই কলির মাহাত্ম্য।"(১২৭)

যাঁরা পরহিতৈষী, তাদের মুর্খ ও নির্বোধ বলা হয়েছে। আসলে পরোক্ষে লেখক ত্রৈলোক্যনাথ আধুনিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী স্বার্থপর ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ করেন। এই অমাবস্যা বাবাজী বলে, কন্যা সন্তান বংশের কলঙ্ক বা অভিশাপ। এরকম জঘন্য ও মর্মান্তিক মনোভাবকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। সদ্য জন্মানো কমলার উদ্দেশ্যে বাবাজী বলে;—

> "কমলা তুমি হও দূর। যাও শীঘ্র যমপুর।
> খাও গুড় কাটো সূত। তোমায় চাই না-চাই পূত।"(১২৮)

—এরকম জঘন্য লিঙ্গ বৈষম্যের প্রসঙ্গ পাঠকের মানবিকতাকে জাগিয়ে তোলে।

'ভূত ও মানুষ' (১৮৯৭) গল্পগ্রন্থের আর একটি বিখ্যাত গল্প 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'। গল্পটিতে ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পরোক্ষে ব্যঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে। ধর্মীয় সচেতনতার অভাবে আমাদের ধর্মভীরু সমাজে, এক শ্রেণীর লোক আছে যারা কৌশলে আপন স্বার্থসিদ্ধ করে। গল্পের কথক নয়নচাঁদ, সমাজের ধর্মীয় সচেতনতার অভাবকে কাজে লাগিয়ে আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল হয়। বুজরুকির দ্বারা আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ গল্পটির বিষয়। নয়নচাঁদ নিজের বুজরুকির কথা গৌরবের সঙ্গে বলেছে;—

> "একবার আমার বড়ই দুর্ব্বৎসর পড়িয়াছিল। খাওয়া কোনও দিন হয় কোনও দিন হয় না। ভাগ্যক্রমে এমন সময় কলিকাতায় বসন্তের হিড়িকটি পড়িল। পরে যিনি যা করুন, কিন্তু ফিকিরটি আমি প্রথম বাহির করি। জলা হইতে দিব্য একটু এঁটেল মাটী লইয়া আসিলাম। তাই দিয়া চমৎকার একটা শীতলা গড়িলাম। শীতলা গড়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। গোল করিয়া মাটির একটি চাবড়া করিলেই হইল। তাহার উপর উত্তমরূপে সিন্দুর মাখাইলাম, টানা টানা লম্বা লম্বা দুইটি চক্ষু করিলাম, পুরাতন রাঙতা দিয়া শীতলাটি ছোট বড় বসন্তে ছাইয়া ফেলিলাম। শীতলাটি হাতে করিয়া গিন্নীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায়

চলিলাম ...আমার অভিপ্রায় যে, মরসুম্ থাকিতে থাকিতে দু পয়সা রোজগার করিয়া পুনরায় ইহার বক্সির কাছে ফিরিয়া আসি।...বলিব কি ভাই আর রোজগারের কথা! ধামা ধামা চা'ল আর গণ্ডা গণ্ডা পয়সা ধামায় যেন পয়সা বৃষ্টি হইতে লাগিল।"[১২৯]

নয়নচাঁদ আরো বলে;— "...কলেজের সেই যারা এম.এ. পাশ দিয়াছে, সভা করিয়া তাহারা আমার শীতলার বক্তৃতা করিল।"[১৩০] এইসব বক্তব্যে সমাজে আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর মনেও যে ধর্মীয় কুসংস্কার স্পষ্ট, তা লেখক ব্যঙ্গের মধ্যে তুলে ধরেছেন। বিশেষত সর্বোচ্চ শিক্ষিত এম.এ. পাশ করা সচেতন নাগরিকের মনে লালিত ধর্মীয় কুসংস্কার অত্যন্ত বেদনাবহ। লেখক ত্রৈলোক্যনাথ পরোক্ষে তথাকথিত পুঁথিগত শিক্ষিত শ্রেণীকে ব্যঙ্গ করেন।

'নয়নচাঁদের ব্যবসা'য় জানা গেল, নয়নচাঁদ ধর্মভীরু সমাজে বুজরুকির দ্বারা প্রচুর অর্থসম্পত্তির অধিকারী হয়েছে। এই গল্পে লেখক ত্রৈলোক্যনাথ সমাজের ধর্মীয় চেতনাহীনতার দিকটি উদ্‌ঘাটন করেন। এরকম একটি গল্প পাঠককে ধর্মীয় বুজরুকি থেকে সচেতন করবে—সেকথা বলাই বাহুল্য।

এবারে বাংলা কথাসাহিত্যের মহিলা কথাশিল্পী স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-১৯৩২) উনিশ শতকের ছোটগল্প বিষয়ে আলোচনা করা হবে। উনিশ শতকের শিক্ষা সংস্কৃতির আলোকশিখা ঠাকুর পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে আলোকিত করেছিল। ডঃ সুকুমার সেন স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখিকা হয়ে উঠার বিষয়ে লিখেছেন;—

"দেবেন্দ্রনাথের কন্যারা প্রথমে ঘরে পড়িয়া পরে নব-প্রতিষ্ঠিত বেথুন স্কুলে ভর্তি হইতেন কিন্তু অল্প বয়সে বিবাহ হইত বলিয়া তাঁরা স্কুলে বেশিদিন পড়িতে পাইতেন না। প্রথম ব্যতিক্রম ঘটিল চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-১৯৩২) বেলায়। তখন দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ সিভিলিয়ান হইয়াছেন। মেজোদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ও তেসেজে বা "ফুল" দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবে পরিবারে স্ত্রী স্বাধীনতা বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ছেলেরা সকাল-সন্ধ্যা গৃহশিক্ষকদের কাছে উচ্চতর পাঠ লইতেন। তাঁহাদের কাছে স্বর্ণকুমারীও পড়িতেন। কাদম্বরীদেবীর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সখ্য হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও লেখাপড়ার বিষয়ে তাঁহার কিছু আড়াআড়ি হইয়াছিল। এই সূত্রে স্বর্ণকুমারীর লেখিকারূপে আবির্ভাব সম্ভাবিত হইয়াছিল।।"[১৩১]

শুধু বাংলা কাব্য ও সাহিত্যের লেখিকারূপেই নয়, বাংলার নারীর দুর্দশা মোচনের জন্য স্বর্ণকুমারী দেবী 'সখি সমিতি', 'মহিলা শিল্পমেলা', 'বিধবা শিল্পাশ্রম' এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতেন। এছাড়া থিয়োসফি সোসাইটির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। আমরা লক্ষ করব, এই স্বর্ণকুমারীদেবী কংগ্রেসের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিবেশনে

(১৮৮৯ ও ১৮৯০) যোগদান করেছিলেন। অতএব সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা, নারী জাতির দুর্দশা মোচনে একনিষ্ঠতা, ধর্মীয় বিষয়ে আগ্রহ ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ স্বর্ণকুমারী দেবীর আধুনিক মানসিকতার পরিচয়।

স্বর্ণকুমারী দেবী স্বদেশীয় নারীর দুরবস্থায় যথেষ্ট মর্মাহত ছিলেন। তিনি নারী সমাজের মঙ্গলের জন্য 'সখি সমিতি', 'মহিলা শিল্পমেলা', 'বিধবা শিল্পাশ্রম'এর সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তাঁর লেখা গল্পে স্বদেশের নারী সমাজের যন্ত্রণা, অধিকারহীনতা ও কখনো কখনো নারীর ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত। প্রসঙ্গত ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন;—

> "...স্বর্ণকুমারীর সকল সার্থক সৃষ্টিই শিল্পীর এই নারী ধর্মের দ্বারা বিভান্বিত।...নারীর অনুভব ও চেতনা নিয়ে সমাজ পরিবার ও জীবনকে দেখতে পারার এই ব্যক্তিত্বপৃষ্ট আন্তরিকতাবশে স্বর্ণকুমারীর গল্প বাংলা কথাসাহিত্যে এক নূতন স্বাদুতার সঞ্চার করেছিল।"(১৩২)

উনিশ শতকে স্বর্ণকুমারী দেবী যখন সাহিত্য চর্চা করেছিলেন, তখন মাতৃভাষায় মহিলা কথাশিল্পীর বাহুল্য ছিল না। স্বর্ণকুমারী দেবী যেন দেশীয় নারী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। অন্যান্য লেখকের থেকে তাঁর লেখায় একটু ভিন্ন স্বাদ পাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ নারী হয়ে নারীর অন্তর্লোকের দ্বার উন্মোচন তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। স্বর্ণকুমারীর রচনার ভিন্নতা এখানেই। আমরা স্বর্ণকুামরী দেবীর কয়েকটি গল্প বিশ্লেষণ করে দেখব, স্বজাতির আত্মচেতনার উন্মোচনের যুগে তাঁর লেখা কোন ইতিবাচক বার্তা শোনায় কিনা।

স্বর্ণকুমারীর একটি বিখ্যাত গল্প 'কেন?' (১২৯৮)। সংসারে স্বামীর ভালোবাসা পাওয়ার সুগভীর আবেদন প্রকাশিত হয়েছে 'কেন?' গল্পে । গল্পটিতে আমরা লক্ষ করব, পুরুষ তার ভোগময় জীবনকে চরিতার্থ করতে গিয়ে গৃহে স্ত্রীকে নিপীড়ন করছে। এবিষয়ে স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন;—

> "সংসারে স্বামীর ভালবাসা যাহার নাই, তাহার আবার কিসে সুখ? ...স্বামী যে ভালবাসেন না পোড়া প্রাণে তাহাও সয়, কিন্তু তাঁহার এই অদর্শন সহে না। নিয়মিত সময়ে তাঁহার যে দিন দেখা না পাই, সেদিন প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, মনে হয় স্বামী আসিয়া আমাকে যদি এখন পাদুকাঘাত করেন ত ইহার তুলনায় তাহাও সুখ।"(১৩৩)

'কেন?' পাঠ করলে পুরুষ প্রধান সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থান জানা যায়। অবশ্য গল্পের শেষে স্বামী স্ত্রীর মিলন দৃশ্য পাঠককে তৃপ্তি এনে দেয়। কিন্তু সে মিলনেও পুরুষ শাসিত সমাজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী, স্বামীর হঠাৎ পরিবর্তনের কারণ জানতে চেয়েছে। অথচ স্বামী তা অস্বীকার করেছে। স্বামী অনুরোধের সুরে যেন নির্দেশ দিয়েছে কারণটি না জানার জন্য। স্বামীর পরিবর্তনের কারণ জানার অধিকার স্ত্রী পায়নি। এতে নারীর প্রতি

বৈষম্যই প্রতিষ্ঠিত।

'কেন?' গল্প যদিও মিলনান্ত তবুও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আগাগোড়া স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠিত। লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর এই গল্পটি সংসারে পুরুষের স্বেচ্ছাচারের পরিবর্তে নারীকে তার মর্যাদা দেওয়ার আন্তরিক আবেদন ধ্বনিত হয়।

স্বর্ণকুমারী দেবীর আরেকটি বিখ্যাত গল্প 'ক্ষত্রিয়-রমণী' (১২৯৩)। 'ক্ষত্রিয়-রমণী' গল্পে লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী নারীর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। সেজন্য তিনি স্বদেশের রাজপুত নারীর ইতিহাস থেকে কাহিনী নির্বাচন করেন। আমরা লক্ষ করি, মেবারের যুবরাজ ও তাঁর পারিষদ রাজপুত রমণীর বীরত্বে বিস্মিত। মেবারের যুবরাজ মৃগয়ায় নানা অস্ত্রে সজ্জিত হয়েও একটি শূকর শিকার করতে পারছিলেন না। অথচ রাজপুত যুবতী অনায়াসে একটি ভুট্টাগাছের আঘাতে শূকরকে আহত করে। গল্পের ভাষায়;—

> "যুবতী নির্ভয় চিত্তে অমনি আক্রমণোদ্যত শূকরের মস্তকে সেই ভুট্টাদণ্ড দ্বারা সবলে আঘাত করিলেন, সে আঘাতে শূকর যেন বজ্রাহত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল,—সেই সময় যুবরাজের অশ্বও নিকটে আসিয়া পড়িল, ... রমণী হাসিতে হাসিতে শূকরের কান ধরিয়া তাঁহার নিকট টানিয়া আনিল, যুবরাজ তাহাকে অস্ত্রবিদ্ধ করিলেন, আর সকলে অবাক হইয়া রমণীর পানে চাহিয়া রহিল।"(১৩৪)

অপ্রতিরোধ্য শূকরকে আহত করাই নয়, এই রাজপুত রমণীর পাখি তাড়ানো ঢিল যুবরাজের ঘোড়াকে লাগলে ঘোড়া আহত হয়। যুবরাজ রাজপুত যুবতীকে ভয় দেখাতে গেলে নিজেই ঘোড়া থেকে পড়ে যান। এই গল্পে ক্ষত্রিয় রমণীর শুধু সাহস ও বীরত্বের পরিচয়ই নয়, সঙ্গে কর্তব্য বোধ বা সেবা পরায়ণ মনোভাবও স্পষ্ট। যা ক্ষত্রিয় রমণী চরিত্রটির মানবিক গুণের পরিচয় বহন করে। ঢিলের আঘাতে ঘোড়া আহত হলে ক্ষত্রিয় রমণী অন্যায় স্বীকার করে। ক্ষত্রিয় রমণী বলে;— "আমাকে মার্জ্জনা করুন—আমি পাখীর দৌরাত্ম্য হইতে ক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য ঢিল ছুঁড়িতেছিলাম—দৈবক্রমে অশ্বের পায়ে আসিয়া পড়িয়াছে,"(১৩৫) শুধু মার্জনা প্রার্থনাই নয়, আহত ঘোড়াকে সুস্থ করার জন্য ঔষধ দিয়েছে। স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন;— "যুবতী একটু সরল হাসি হাসিয়া, সঙ্গের আনীত ঔষধ বাহির করিয়া অশ্বের উরুদেশে লেপন করিতে লাগিল,"(১৩৬)

শেষ পর্যন্ত মেবারের যুবরাজ ক্ষত্রিয় রমণীকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। লেখিকা বলেন;—

> "পরদিনই যুবতীর সহিত যুবরাজের বিবাহ হইয়া গেল। যুবরাজ শিকার করিতে আসিয়া বধূ সঙ্গে গৃহে গমন করিলেন। এই মহিষীর গর্ভেই পরে বীর শ্রেষ্ঠ হামীর — যিনি ১২ বৎসর বয়সে শত্রু জয় করিয়া মিবার রাজপুতকূল উজ্জ্বল করেন — তাঁহার জন্ম হয়।"(১৩৭)

অর্থাৎ মায়ের শৌর্য-বীর্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী বীর পুত্র হামীর। লেখিকা যেন পরোক্ষে বলতে চেয়েছেন বীর হামীর মায়ের মতোই শৌর্য ও বীর্যবান। হামীরের মত সন্তান জন্ম দেওয়ার পিছনে যেন শৌর্য-বীর্যবান মায়ের অনেকটা অবদান রয়েছে।

স্বর্ণকুমারীদেবী স্বদেশের নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য সারা জীবন কাজ করে গেছেন। তিনি 'সখি সমিতি', 'মহিলা শিল্পমেলা', বিধবা শিল্পাশ্রম' প্রভৃতি সভা-সমিতি বা সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতেন। যেগুলির প্রধান উদ্দেশ্য স্বদেশ ও নারী সমাজের উন্নতি বা মঙ্গল করা । নারী সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও স্ত্রী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী স্বর্ণকুমারীদেবী তাঁর 'ক্ষত্রিয়-রমণী' গল্পে নারীর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ করেন। সমকালের পাঠককে যা নারীর মানবিক মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন করেছিল।

এবার বাংলা ছোটগল্পের প্রথম যথার্থ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উনিশ শতকের গল্প বিষয়ে আলোচনা করা হবে। উনিশ শতকে বাংলা ছোটগল্প সার্থক শিল্পরূপ পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে। 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৮৯১) 'দেনাপাওনা', 'পোষ্টমাষ্টার', 'গিন্নি', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান' ও 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প। কবি ও গল্পকার রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্বন্ধে ধারণা ছিল—

"ছোটোপ্রাণ, ছোটোব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারটি অশ্রু জল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি' মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।" (১৩৮)

এই বৃহৎ জগৎ সংসারে একটি খণ্ড মুহূর্তের শিল্পরূপ ছোটগল্প। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, জীবনের ছোটোখাটো সুখ দুঃখ কথা ছোটগল্পের সামগ্রী। তাতে বর্ণনা, তত্ত্ব ও উপদেশের অবকাশ নেই। আবার সমগ্র গল্পটি পাঠ করে পাঠকের মনে অতৃপ্তির ব্যঞ্জনা বিরাজ করবে। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'-এ এই জাতীয় শিল্পরূপ বাংলা সাহিত্যে অভিনব । যার সূচনা উনিশ শতকে হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত ৬টি গল্পে। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণকে সমৃদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায় অসংখ্য ছোটগল্প রচনা করেন। অবশ্য আমরা এখানে শুধু উনিশ শতকের গল্প আলোচনা করব। এই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পে বাঙালীর নিজস্বতা ও নারীর মানবিক মূল্যায়নের মতো কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাব।

'বর্ষাযাপন' কবিতায় ছোটগল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রমনের অকৃত্রিম অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। কবি লিখেছেন;—

"বর্ষার সমান সুরে অন্তর বাহির পুরে
সংগীতের মুষলধারায়,
পরানের বহুদূর কূলে কূলে ভরপুর,
বিদেশী কাব্যে সে কোথা হায়!
তখন সে পুঁথি ফেলি, দুয়ারে আসন মেলি
বসি গিয়ে আপনার মনে,
কিছু করিবার নাই চেয়ে চেয়ে ভাবি তাই
দীর্ঘদিন কাটিবে কেমনে।
মাথাটি করিয়া নীচু বসে বসে রচি কিছু
বহুযত্নে সারাদিন ধরে—
ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।" (১৩৯)

সবসময় বিদেশী কাব্য-সাহিত্য মনকে তৃপ্তি দিতে পারে না। সেজন্য জাতির নিজস্ব জীবন প্রবাহ বা নিজস্ব পরিকাঠামোকে মাতৃভাষার সাহিত্যে দর্শন করতে মন পেয়ে বসে। তাই কবি এখানে বলেন — বর্ষার দিনে বিদেশী সাহিত্য পাঠ করে অন্তর তৃপ্তি লাভ করে নি। সে স্বাদ মিটেছে বাংলা ছোটগল্প লিখে। তাহলে আমাদের মনে হতে পারে যে, কবি স্বদেশে বর্ষার পটভূমিতে মাতৃভাষায় ছোটগল্প লিখতে গিয়ে নিশ্চয়ই স্বদেশীয় ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কবির মনকে যা তৃপ্ত করেছে। প্রশ্ন জাগতে পারে—তাহলে সেই স্বদেশীয় বিষয়টি কি? আমাদের মনে হয়েছে — বাংলার প্রকৃতি, পল্লীবাংলার চিত্র ও বাঙালীর নিজস্ব সুখ দুঃখই হল স্বদেশীয় বিষয়।

ছোটগল্পের প্রথম সূচনা হয় বিদেশী সাহিত্যে। অবশ্য অনতিবিলম্বে বাংলা সাহিত্যেও উনিশ শতকেই ছোটগল্প রচিত হয়। কিন্তু দেশীয় ভাষায় গল্প লিখলেই নিজস্ব গল্প হয় না। গল্পকে বাঙালীর সমাজে নিজস্ব করে তুলতে হলে গল্পে বাঙালীর হৃদ-স্পন্দন প্রয়োজন। সেজন্য বাঙালীর সুখ দুঃখ, বাঙালীর জীবন প্রবাহ, বাঙালীর সংস্কৃতি, পল্লীবাংলার চিত্র ও বাংলার প্রকৃতিকে গল্পে ফুটিয়ে তুলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টি প্রথম থেকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর চোখে দেখা অভিজ্ঞতাকে বাংলা গল্পে পরিণত করেছেন। এবিষয়ে যাঁরা সন্দেহ করেন, তাদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন;—

"অসংখ্য ছোট ছোট লিরিক লিখেছি, বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোনো কবি এত লেখেন নি। কিন্তু আমার অবাক লাগে, তোমরা যখন বল যে, আমার গল্পগুছ গীতিধর্মী। এক সময় ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে; দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা।...আমি বলবো, আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটেনি। যা কিছু লিখেছি, নিজে দেখেছি; মর্মে অনুভব করেছি; সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। গল্পে যা লিখেছি তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা; আমার নিজের দেখা। তাকে গীতিধর্মী বললে ভুল করবে। ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে, আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালী সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।"(১৪০)

কিংবা তিনি 'ছিন্নপত্র'-এ আরো লিখেছেন;—

"সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল, নিঃসন্দেহে তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাত ছিল কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে মানব জীবনের সেই সুখ দুঃখের ইতিহাস; যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বার বার চলে এসেছে কৃষি ক্ষেত্রে, পল্লীপ্রাঙ্গণে আপন প্রাত্যহিক সুখ দুঃখ নিয়ে। কখনো বা মোগল রাজত্বে, কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতি সরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে, কোনো সামন্ততন্ত্র নয়, কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়।"(১৪১)

আমরা 'ছিন্নপত্র'-এ গল্পগুচ্ছের বাস্তবতার কথা জানলাম, যা একান্ত বাঙালীর নিজস্ব সুখ দুঃখ, বাংলার প্রকৃতি, পল্লীবাংলার চিত্রে সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথে এই বাস্তবতার দাবী অযৌক্তিক কিছু নয়। এই বাস্তবতা কবি বর্ষার দিনে বিদেশী কাব্যে খুঁজে পান নি। আর তাই বাস্তবতায় সমৃদ্ধ সাহিত্য লিখতে গিয়ে বাংলা ছোটগল্প তাঁর হাতে শিল্প সমৃদ্ধ হয়। আমরা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্পের বিশ্লেষণ করে বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করব।

প্রথমে রবীন্দ্রনাথের গল্পে বাঙালীর সুখ দুঃখের পরিচয় নেওয়া যাক্। 'দেনাপাওনা' (১৮৯১) রবীন্দ্র গল্প সাহিত্যের বিখ্যাত গল্প। গল্পটিতে বাঙালীর সুখ দুঃখের পরিচয় ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরে ফুটেছে। 'দেনাপাওনা'য় বাঙালী সমাজের পণপ্রথার জঘন্য দিক শিল্পরূপ পেয়েছে। রামসুন্দর তার অতি আদরের মেয়ে নিরুপমাকে রায়বাহাদুরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। পুরো পণ দিতে না পারায় রামসুন্দর অনেক অপমানিত হয়। শুধু তাই নয়, নিরুপমা শ্বশুরবাড়িতে অবহেলার পাত্রী হয়ে উঠে। পণপ্রথার এই সমস্যা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। বাঙালী ঘরের এরকম একটি ঘৃণ্য প্রথাকে রবীন্দ্রনাথ 'দেনাপাওনা' গল্পে শিল্পরূপ দেন। আর যাই হোক 'দেনাপাওনা' গল্পটির এজাতীয় সমস্যা কোনমতেই অবাস্তব বা অতিরঞ্জিত নয়।

পল্লীবাংলার মানুষের মন সহজ ও সরল। তারা বিলাত বা কলকাতার নাগরিকের মতো কৃত্রিমভাবে

ভাবের আদান প্রদান করে না। তারা রাগ, শোক, স্নেহ, প্রেম খোলাখুলি প্রকাশ করে। 'শাস্তি' (১৩০০) গল্পে দুখিরাম রুই ও ছিদাম রুই এর মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকলেও তাদের স্ত্রীর মধ্যে বচসা লেগেই থাকত। লেখক রবীন্দ্রনাথ বলেন;—

> "দুখিরাম রুই এবং ছিদাম রুই দুই ভাই সকালে যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল তখন তাহাদের দুই স্ত্রীর মধ্যে বকাবকি চেঁচামেচি চলিতেছিল। কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য নানাবিধ নিত্য কলরবের ন্যায় এই কলহ কোলাহলও পাড়াসুদ্ধ লোকের অভ্যাস হইয়া গেছে।"(১৪২)

অশিক্ষিত সাধারণ পরিবারে এরকম কলহ সচরাচর হয়ে থাকে। এ পল্লীবাংলারই চিত্র ।

গ্রাম বাংলায় জাতপাত, আচার-আচরণ, শুচি-অশুচিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। 'অনধিকার প্রবেশ' (১৩০১) গল্পে গ্রাম বাংলার সামাজিক শুচি-অশুচির দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। জয়কালী তার সমস্ত নিষ্ঠা দিয়ে মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন;—

> "অনাচারী ব্যক্তি পরমাত্মীয় হইলেও দেবালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না। জয়কালীর একটি যবনকরপক্ক, কুক্কুটমাংস-লোলুপ ভগিনীপতি আত্মীয়সন্দর্শন উপলক্ষে গ্রামে উপস্থিত হইয়া মন্দির-অঙ্গনে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, জয়কালী তাহাতে ত্বরিত ও তীব্র আপত্তি প্রকাশ করাতে সহোদরা ভগিনীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ সম্ভাবনা ঘটিয়েছিল।"(১৪৩)

পল্লীবাংলার সমাজের চিত্রই এরকম। অবশ্য এই মন্দিরে আর্ত শূকর প্রবেশ করলে জয়কালী তাকে আশ্রয় দেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন;—"এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজনামধারী অতি ক্ষুদ্র দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।"(১৪৪) এখানে সমাজে প্রচলিত শুচিতা-অশুচিতা বা জাতপাতের অমানবিকতাকে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেন।

রবীন্দ্রনাথ জমিদারী পরিদর্শনের জন্য পুর্ববঙ্গে দীর্ঘদিন কাটিয়েছিলেন। পুর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশ নদীমাতৃক। এই সময়ের কোন কোন গল্পে পল্লীবাংলার নদী বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। 'সমাপ্তি' গল্পে বাংলার নিজস্ব প্রকৃতি চিত্র ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> "মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। মেঘ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভাদ্র মাসের পূর্ণ নদী ফুলিয়া ফুলিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিল, মৃণ্ময়ীর সমস্ত শরীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; অঞ্চল পাতিয়া সে নৌকার মধ্যে শয়ন করিল এবং এই দুরন্ত বালিকা নদী—দোলায় প্রকৃতির স্নেহপালিত শান্ত শিশুটির মতো অকাতরে ঘুমাইতে লাগিল।"(১৪৫)

মৃণ্ময়ীর শান্ত শিশুর মতো ঘুমানোর কারণ প্রকৃতির বিশেষ রূপ। যে রূপ নদীমাতৃক পল্লী বাংলাতেই সচরাচর দেখা যায়। ভাদ্র মাসে মুষলধারে বৃষ্টি, নদীর জলে ঢেউ পল্লীপ্রকৃতির খুবই পরিচিত দৃশ্য।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বাংলা গল্পে শুধু বাঙালীর নিজস্ব সুখ দুঃখের গল্পই লিখেছেন তা নয়। তিনি বাংলা গল্পকে আরও সমৃদ্ধ করতে গিয়ে বৃহত্তর মানবের সুখ দুঃখের কথা বলেন। অন্যভাবে বলা যায়, যে অনুভূতি পৃথিবীর খণ্ডিত দেশ-কাল-সীমার অপেক্ষা রাখেনা, তাকে রবীন্দ্রনাথ শিল্পরূপ দিতেন। 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পের নায়ক গ্রামের বালিকা রতনের প্রতি যে মনোভাব ব্যক্ত করেন, সেই দার্শনিক মনোভাব যে কোন দেশ-কাল-সীমার ঊর্ধ্বে। পোষ্টমাষ্টার বলেছিল—এই পৃথিবীতে কে কার। এই দার্শনিক ভাবনার গল্পরূপ 'পোষ্টমাষ্টার' পৃথিবীর যে কোন সহৃদয় ব্যক্তির মনে স্থায়ী ছাপ রাখে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বর্ষাযাপন কবিতায় বলেছেন;—

"জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা, অখ্যাত কীর্তির ধুলা,
কত ভাব, কত ভয় ভুল—
সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝর ঝর বরষার মতো—
ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি
শব্দতার শুনি অবিরত।
সেই-সব হেলাফেলা, নিমিষের লীলাখেলা
চারি দিকে করি স্তূপাকার,
তাই দিয়ে করি সৃষ্টি একটি বিস্মৃতিবৃষ্টি
জীবনের শ্রাবণনিশার।"[১৪৬]

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ জগতের অজ্ঞাত অখ্যাত ছোটোখাটো জীবন ও ভাবের শিল্পরূপ দিয়ে বাংলা ছোটগল্পকে বিশ্বসাহিত্যের উপযুক্ত করে তোলেন।

ঠাকুর পরিবারে নারী স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিল। রবীন্দ্রনাথও নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। নারী স্বাধীনতার বিষয়ে তাঁর লেখনী ছিল মুখর। তিনি সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণের মতো বাংলা ছোটগল্পেও এদেশের পুরুষ প্রধান সমাজের বর্বর দিক ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর স্বীকৃত প্রথম গল্প 'দেনাপাওনা' (১৮৯১) থেকে শুরু করে শেষ

জীবন পর্যন্ত 'তিনসঙ্গী' (১৩৪৭)-র গল্পগুলি ধারাবাহিক আলোচনা করলে বাঙালী নারীর উত্তরণের একটি চিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। এখানে আমরা উনিশ শতকে রচিত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে বাঙালী নারীর সামাজিক অবস্থান বিষয়ে আলোচনা করব।

সমকালের পুরুষ প্রধান সমাজে নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এই অধিকার হীনতা সভ্য সমাজে একেবারে ঘৃণ্য। রবীন্দ্রনাথ নারীর প্রতি অন্যায়, অবিচার, নিপীড়নকে শিল্পরূপ দিয়ে পাঠকের চেতনার বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করেন। বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য কয়েকটি গল্পের আলোচনা করা হয়েছে। 'দেনাপাওনা' (১৮৯১) গল্পে সমাজে প্রচলিত পণপ্রথার নির্মম চিত্র রবীন্দ্রনাথ অঙ্কন করেন। সমাজের এই অবাঞ্ছিত প্রথাটির জন্য নিরুপমার মতো একটি নববধূকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল।

লিঙ্গ বৈষম্যের বিখ্যাত একটি গল্প 'শাস্তি' (১৩০০)। ভাইয়ের অন্যায়ের দায় ছিদাম তার স্ত্রীকে নিতে বলেছে। এবিষয়ে সে রামলোচনকে বলেছে;— "ঠাকুর, বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।"[১৪৭] একথা অত্যন্ত নির্মম। সত্যিই ভাইয়ের ফাঁসি হলে ভাই পাওয়া যাবে না। অথচ স্ত্রীর ফাঁসি হলে সহজেই স্ত্রী আরো পাওয়া যাবে। বক্তব্যে নারীর চরম অধিকার হীনতার প্রকাশ পায়। কেননা, সমাজে পুরুষ চাইলেই বহু বিবাহ করতে পারে। এখানে সমাজের বহু বিবাহের জঘন্যতার দিকটি উদ্‌ঘাটিত। যে বহু বিবাহ নারীকে তার মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। আমরা দেখলাম 'দেনাপাওনা' ও 'শাস্তি' গল্পটি নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আবেদন মূলক গল্প।

'মানভঞ্জন' (১৩০২) পুরুষের অবহেলা ও নিপীড়নে জর্জরিত নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার গল্প। 'মানভঞ্জন', ইতিপূর্বে রচিত 'দেনাপাওনা' ও 'শাস্তি' গল্পের মত স্বামী বা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অন্যায় সহ্য করার গল্প নয়। 'মানভঞ্জন'-এ নায়িকা গিরিবালা স্বামীর অবহেলার প্রতিশোধ নিয়েছে। উচ্ছৃঙ্খল গোপীনাথ গৃহে স্ত্রী ছেড়ে 'গান্ধর্ব থিয়েটার'-এর নায়িকার প্রতি আসক্ত। দিনের পর দিন অবহেলিত গিরিবালা নিজেই প্রধান নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং স্বামীসহ অসংখ্য দর্শকের সামনে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে।

'মানভঞ্জন' গল্পে রবীন্দ্রনাথ নায়িকা গিরিবালার যোগ্যতা প্রমাণমূলক একটি কাহিনী চয়ন করেন পাঠককে সচেতন করার জন্য, একথা বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না।

আমরা বলতে পারি, উনিশ শতকেই — রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের সার্থক শিল্পরূপ দিয়েছেন, বাংলা ছোটগল্পকে বাঙালীর নিজস্ব ছোটগল্পে রপান্তরিত করেন এবং বাঙালী সমাজের নারীর প্রতি সংকীর্ণ মানসিকতা বর্জন করার আহ্বান জানান।

অতএব বলা যায়, উনিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যকে স্বদেশ ভাবনা বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। আমরা বলতে পারি — এই স্বদেশ ভাবনা কখনো উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের নতুন প্রকরণ উপন্যাস ও ছোটোগল্পের সার্থক শিল্পরূপদানের ভাবনার দ্বারা স্বদেশীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে; আবার কখনো উপন্যাস ও ছোটোগল্পের কাহিনীতে লোকশিক্ষা ভাবনার দ্বারা স্বদেশবাসীকে সচেতন করতে সাহায্য করেছে। যাকে স্বদেশভাবনা বলে অভিহিত করলে অতিশয়োক্তি হয় না।

উল্লেখপঞ্জী

১। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৭-১৯৯৮, পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০০০-২০০১, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ১।

২। Preface, প্যারীচাঁদ রচনাবলী, সম্পাদক — ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম প্রকাশ, ১২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, ২৯শে নভেম্বর ১৯৭১, মণ্ডল বুক হাউস, পৃ: ৩।

৩। ভূমিকা, প্যারীচাঁদ রচনাবলী, সম্পাদক— ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম প্রকাশ, ১২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, ২৯শে নভেম্বর ১৯৭১, মণ্ডল বুক হাউস, পৃ: ৩।

৪। প্রথমবারের বিজ্ঞাপন, বিজয় বসন্ত — হরিনাথ মজুমদার, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৭১ শক, প্রাপ্তিস্থান-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সংখ্যা-২৩৩৩০৫, ক্যাটালগ্ নং-৮৯১.৪৪৩৬, হ.ম/বি, পৃ:

৫। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৭-১৯৯৮, পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০০০-২০০১, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ৩৫

৬। ঐতিহাসিক উপন্যাস, ভূদেব রচনাসম্ভার — ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক — প্রমথনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ, কলি-১২, ২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৯, পৃঃ ২৬৮।

৭। বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: আটাশ।

৮। [illegible] বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: আটাশ।

৯। উপন্যাস পরিচয়, বঙ্কিম জীবনী—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক - অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায়, ১ম প্রকাশ, ১৩১৮, ৪র্থ সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৯৫, পৃ: ১৯৪-১৯৫।

১০। বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন, বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, পঞ্চদশ মুদ্রণ মাঘ ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ২৩৬।

১১। বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ত্রিশ।

১২। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৭-১৯৯৮, পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০০০-২০০১, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ৬৯।

১৩। মৃণালিনী, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ১৬৫।

১৪। বিষবৃক্ষ, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ২০২।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৩।

১৬। সাম্য, বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, পঞ্চদশ মুদ্রণ মাঘ ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৩৪৭।

১৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪৭।

১৮। বিষবৃক্ষ, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ১৯৪।

১৯। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৭-১৯৯৮, পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০০০-২০০১, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ৬৪।

২০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৫।

২১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৯।

২২। স্বর্ণলতা, সম্পাদক— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় মুদ্রণ—আশ্বিন ১৪০০, পৃ: ২।

২৩। ভূমিকা, স্বর্ণলতা, সম্পাদক— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় মুদ্রণ—আশ্বিন ১৪০০, পৃ: ।

২৪। স্বর্ণলতা, সম্পাদক— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় মুদ্রণ—আশ্বিন ১৪০০, পৃ: ৪।

২৫। ভূমিকা, স্বর্ণলতা, সম্পাদক— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় মুদ্রণ—আশ্বিন ১৪০০, পৃ: ৵।

২৬। সূচনা, বউঠাকুরাণীর হাট, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৬০৩।

২৭। প্রাগুক্ত, ৬০৩।

২৮। সূচনা, রাজর্ষি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৭০১।

২৯। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, প্রশান্তকুমার পাল সম্পাদিত, ২০০২ সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯২০, প্রথম সুবর্ণরেখা সংস্করণ ঃ ২০০২, পৃ: ৭৬।

৩০। বিজ্ঞাপন, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: চল্লিশ।

৩১। বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, পঞ্চদশ মুদ্রণ মাঘ ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ২৩৭।

৩২। মৃণালিনী, বঙ্কিম রচনাবলী ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ১১৮।

৩৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৮।

৩৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৮।

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৫।

৩৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৬।

৩৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২০।

৩৮। বিজ্ঞাপন, রাজসিংহ, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: উনচল্লিশ।

৩৯। প্রাগুক্ত, পৃ: উনচল্লিশ।

৪০। প্রাগুক্ত, পৃ: উনচল্লিশ।

৪১। রাজসিংহ, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৫৩৭।

৪২। বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: আটত্রিশ।

৪৩। প্রাগুক্ত, পৃ: আটত্রিশ-উনচল্লিশ।

৪৪। উপসংহার, গ্রন্থকারের নিবেদন, রাজসিংহ, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৫৭৯।

৪৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭৯।

৪৬। রমেশ রচনাবলী (সমগ্র উপন্যাস)—রমেশচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রথম মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী ১৯৬০, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ১৯৯০, পৃ: উনত্রিশ।

৪৭। মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত, রমেশ রচনাবলী (সমগ্র উপন্যাস)—রমেশচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রথম মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী ১৯৬০, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ১৯৯০, পৃ: ২০২।

৪৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ২০২-২০৩।

৪৯। বঙ্গবিজেতা, রমেশ রচনাবলী (সমগ্র উপন্যাস)—রমেশচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রথম মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী ১৯৬০, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ১৯৯০, পৃ: ২।

৫০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭।

৫১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭।

৫২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৮।

৫৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭০।

৫৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩।

৫৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯।

৫৬। মাধবী কঙ্কণ, রমেশ রচনাবলী (সমগ্র উপন্যাস)—রমেশচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রথম মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী ১৯৬০, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ১৯৯০, পৃ: ১৫০।

৫৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৮।

৫৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৫।

৫৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৫।

৬০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৫।

৬১। মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত, রমেশ রচনাবলী (সমগ্র উপন্যাস) — রমেশচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রথম মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী ১৯৬০, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ১৯৯০, পৃ: ১৬৬।

৬২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৭।

৬৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ২২৫।

৬৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ২২৬।

৬৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭২।

৬৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৭।

৬৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৭।

৬৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৩।

৬৯। রাজপুত জীবন সন্ধ্যা, রমেশ রচনাবলী (সমগ্র উপন্যাস) — রমেশচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রথম মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী ১৯৬০, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ১৯৯০, পৃ: ২৫৫।

৭০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১১।

৭১। বিজ্ঞাপন, দেবীচৌধুরাণী, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: বিয়াল্লিশ।

৭২। আনন্দমঠ, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৫৯১।

৭৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৯০।

৭৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪৩।

৭৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪৩।

৭৬। বিজ্ঞাপন, দেবীচৌধুরাণী, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: চুয়াল্লিশ।

৭৭। দেবীচৌধুরাণী, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৬৭১।

৭৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৬৬।

৭৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৯৭।

৮০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭০৭।

৮১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৫১।

৮২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৬৮।

৮৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৫১।

৮৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৫৩।

৮৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭১৬।

৮৬। বিজ্ঞাপন, সীতারাম, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ছেচল্লিশ।

৮৭। সীতারাম, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৭৬৮।

৮৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৬৮।

৮৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৭৮।

৯০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৭৮।

৯১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৮৩।

৯২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭২৪।

৯৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৩৬।

৯৪। বিষবৃক্ষ, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ২২১।

৯৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৩।

৯৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮২।

৯৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ২০২।

৯৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৮।

৯৯। কৃষ্ণকান্তের উইল, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৪৭০।

১০০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৮৫।

১০১। চন্দ্রশেখর, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৩০২।

১০২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২৩।

১০৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬৭।

১০৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২৭।

১০৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২৭।

১০৬। রজনী, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৩৯৫।

১০৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২৩।

১০৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২৪।

১০৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২৫।

১১০। কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, পঞ্চদশ মুদ্রণ মাঘ ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৬৫।

১১১। দেবীচৌধুরাণী, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৭১৬।

১১২। একা "কে গায় ওই", বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, পঞ্চদশ মুদ্রণ মাঘ ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৪৬।

১১৩। আমার মন, বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, পঞ্চদশ মুদ্রণ মাঘ ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৫৪।

১১৪। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৭-১৯৯৮, পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০০০-২০০১, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ৪৮।

১১৫। সংসার কথা, রমেশ রচনাবলী (সমগ্র উপন্যাস)—রমেশচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রথম মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী ১৯৬০, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ১৯৯০, পৃ: ৪৪৬।

১১৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪৬।

১১৭। সমাজ, রমেশ রচনাবলী (সমগ্র উপন্যাস)—রমেশচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রথম মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী ১৯৬০, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ১৯৯০, পৃ: ৫১৮।

১১৮। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৭-১৯৯৮, পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০০০-২০০১, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ১৩৬।

১১৯। সাহিত্যে ছোটগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৪০৫, পৃ: ১৯৭।

১২০। কালের পুত্তলিকা বংলা ছোটগল্পের একশ বছর ঃ ১৮৯১-১৯৯০ — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ : আশ্বিন ১৪০২, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৮৯, পৃ: ২৩।

১২১। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার—শ্রীভূদেব চৌধুরী, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬২, চতুর্থ প্রকাশ ঃ (পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত)১৯৮৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৯, পৃ: ৪৮।

১২২। কালের পুত্তলিকা বংলা ছোটগল্পের একশ বছর ঃ ১৮৯১-১৯৯০ — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ : আশ্বিন ১৪০২, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৮৯, পৃ: ১২৮-১২৯।

১২৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১ দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ৪৭৪।

১২৪। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার — শ্রীভূদেব চৌধুরী, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬২, চতুর্থ প্রকাশ ঃ (পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত)১৯৮৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৯, পৃ: ৬৫।

১২৫। বীরবালা, ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (অখণ্ড সংস্করণ), সম্পাদনা — সুদেব মুখোপাধ্যায়, কামিনী প্রকাশালয়, প্রথম সংস্করণ ঃ আশ্বিন ১৪১০, পৃ: ৫৮৪।

১২৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৮৪।

১২৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭৩।

১২৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭৪।

১২৯। নয়নচাঁদের ব্যবসা, ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (অখণ্ড সংস্করণ), সম্পাদনা—সুদেব মুখোপাধ্যায়, কামিনী প্রকাশালয়, প্রথম সংস্করণ ঃ আশ্বিন ১৪১০, পৃ: ৫৮৭-৫৮৯।

১৩০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬০১।

১৩১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১ দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ২১৮।

১৩২। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার — শ্রীভূদেব চৌধুরী, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬২, চতুর্থ প্রকাশ ঃ (পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত)১৯৮৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৯, পৃ: ৭২।

১৩৩। কেন, স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্প, সম্পাদক : ড. সমরেশ মজুমদার, রত্নাবলী, ১১-এ, ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ : জৈষ্ঠ ১৪১১, মে ২০০৪, পৃ: ৭২-৭৩।

১৩৪। ক্ষত্রিয় রমণী, স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্প, সম্পাদক : ড. সমরেশ মজুমদার, রত্নাবলী, ১১-এ, ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র লেন, কলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ : জৈষ্ঠ ১৪১১, মে ২০০৪, পৃ: ৮২।

১৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৩।

১৩৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৩।

১৩৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৬।

১৩৮। বর্ষাযাপন, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৫-২৬।

১৩৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫।

১৪০। কালের পুত্তলিকা বংলা ছোটগল্পের একশ বছর ঃ ১৮৯১-১৯৯০ — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ : আশ্বিন ১৪০২, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৮৯, পৃ: ২৫।

১৪১। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫-২৬।

১৪২। শাস্তি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৯ম খণ্ড — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৩৭৭।

১৪৩। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ পৌষ ১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৯০।

১৪৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯২।

১৪৫। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৯ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৩৯১।

১৪৬। রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৬।

১৪৭। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৯ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৩৭৯।